1933

রূপ-লহরী

বা

রূপের কথা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

রূপ-লহরী

বা

রূপের কথা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রিণ্টার—কে, সি, চক্রবর্ত্তী,

গিরীশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৫২নং, সুকিয়া ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ

মহাশয় নিরাপদ-দীর্ঘজীবে—

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু নিত্যম্—

আপনার "বঙ্গবাসী"র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছি, আপনার "বঙ্গবাসী"র সম্পাদক-পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র; কিন্তু "বঙ্গবাসী"র ভাব ও ভাষা চিরদিনই আমার হইয়া থাকিবে। আমি সব ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার "বঙ্গবাসী" এবং আপনাকে কখনও ভুলিতে পারিব না। পাছে আপনি আমাকে ভুলিয়া যান, তাই আমার দুর্দ্দিনের সম্বল এই 'রূপ-লহরী' কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনার করে অর্পণ করিলাম।

আশীর্ব্বাদ করি, আপনি চিরজীবী ও চিরসুখী হইয়া থাকুন; "বঙ্গবাসী" আপনার, আপনি "বঙ্গবাসী"র,—উভয়ের এই সম্বন্ধ যেন চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। কিমধিকমিতি ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ সাল।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-
শ্রীপাঁচকড়ি শর্ম্মণঃ।

বিজ্ঞাপন।

"রূপ-লহরী" প্রকাশ করিতে বড়ই বিলম্ব হইল। দোষ আমারই,—দোষ আমার ভাগ্যের। এ পুস্তকের স্বত্ব ও স্বামিত্ব সকলই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের। আমি লেখক মাত্র।

"মালতী" ও "হাবী" এই দুইটি গল্প ব্যতীত, আর সকল গল্পই "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ দত্ত আমার লিপিকরের কার্য্য করিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

রূপ-লহরীতে আমি রূপের কথাই বলিয়াছি। দেশ-কাল-পাত্রানুসারে আমাদের হিন্দুসমাজে রূপের প্রবাহে কত প্রকারের বিকৃতি সম্ভব, গল্পচ্ছলে আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি। সকল গল্পের মূলে একটু-না-একটু সত্য নিহিত আছে; দুই-একটি গল্পের নায়ক-নায়িকা এখনও জীবিত আছেন। যাহা ঘটে,—যাহা ঘটিতে পারে, আমি তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। সমাজের ক্ষত স্থান দেখাইবারই আমার চেষ্টা; সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে কি না, জানি না। আমাদের মনোবেগের মুখে ধর্ম্মের যে শক্ত বাঁধ বাঁধা ছিল, ইংরেজীশিক্ষার প্রবাহে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেক বিষয়ে আমরা এখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছি; তাই চোখের-রূপে আমরা মজিয়া যাই। রূপ-লহরীতে এইটুকুই

দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। আর এক কথা; এখন রূপের মোহ বড়ই তীব্র। ঠিক যেন গাঁজার নেশা, একেবারেই নেশা জমিয়া যায়। গুণের মোহে এইটুকু হয় না। তাই রূপের মোহে মুগ্ধ যুবক যুবতী একেবারে ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। আমি যাহা দেখাইতে চাহিয়াছি, তাহা দেখিয়া সামাজিকগণ সমাজদেহের রোগের নিদান স্থির করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে, আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইল, মনে করিব। ইতি **২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ সাল।**

শ্রীপাঁচকড়ি শর্ম্মা।
কলিকাতা।

"রূপসাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হ'ল ;
এবার বা আসা হয় বিফল !
ভাবি, যাই চুপে চুপে, যাই বা কি রূপে,
ছ'ঘাটে ঘাঁটি বসিল ॥"

পরিব্রাজক ।

রূপ-লহরী।

কালিন্দী।

(১)

"বাঙ্গালায় কি রূপসী নাই? কিংবা বাঙ্গালার পুরুষগুলা, অবগুণ্ঠনবতী কামিনী দেখিলেই, রূপের কলসী অনুমান করে! আমরা চিকের ভিতর হইতে, গাড়ীর খড়খড়ির মধ্য হইতে, থিয়েটারের শান্তিপুরে-জালের অন্তরাল হইতে, পুরুষমানুষকে দেখি;—ভাল করিয়াই দেখি,—নিভৃতে মনে মনে একাগ্রচিত্তে দেখি,—দেখিয়া, তুলনায় সমালোচনা করি। আমরা জানি, বাঙ্গালায় কয়েকটা পুরুষ সুন্দর ও কয়েকটা কুৎসিত। কিন্তু পুরুষেরা কেমন করিয়া জানিবে—আমাদের মধ্যে কে রূপসী,

কেই বা কুৎসিতা ? গঙ্গা-স্নানের সময় তাহারা চপলা-বিকাশের ন্যায় একবার একনজর আমাদিগকে দেখিয়া লইতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেখার মত দেখা হয় না। তাহারা—

কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,—

এই ভাবে আমাদিগকে দেখে, আর কেবল সুন্দরী দেখে। এক একটা পুরুষ আবার এমন সৌন্দর্য্য-পাগলা যে, পুরুষমানুষকেই সুন্দরী সাজাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া পড়ে। বঙ্কিম-চন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথকে হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজাইয়া, তাহার রূপে পাগল হইয়াছিলেন ;—সে রূপ বর্ণনা করিতে করিতে বঙ্কিম-চন্দ্রের দেড়সের লাল পড়িয়াছিল। গলায় দড়ি ! বাঙ্গালাদেশে কি আর মেয়েমানুষ ছিল না গা !”

“আবার এক রকমের পুরুষ আছে, যাহারা ঘোমটার উপর চটিয়া, অবরোধ-প্রথার উপর অভিমান করিয়া বলে যে, স্ত্রীজাতি সুন্দরী নহে,—সৌন্দর্য্য স্ত্রীলোকের একচেটিয়া নহে, রূপবান্ পুরুষই। এই দলের মধ্যে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ই চাঁই ছিলেন। তিনি বলিতেন পুরুষের দাড়ি আছে, গোঁফ আছে, পুরুষ-সিংহের কেশর আছে, পুরুষ-ময়ূরের নানাবর্ণের পাখা আছে, পুরুষ-কোকিলের স্বর আছে, পুরুষ-বুল্‌বুলীর ঝুঁটি আছে, পুরুষ-বৃষের ককুদ্ আছে, পুরুষ-হস্তীর দাঁত আছে ; সুতরাং পুরুষ সুন্দর, পুরুষ রূপবান্। এ সকল কথা নিরাশ প্রাণের কথা। দেখ না, দেখিতে পাও না, দেখিতে জান না ;—তাই বুঝ না আমরা কেমন, কত সুন্দর ! আমাদের মন হরণ করিবার জন্য,—আমাদের সেবা করিবার জন্য, তোমাদের রূপ,—তোমাদের ঐশ্বর্য্য ! আমরা

যাহাই হই না কেন, আমাদের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য তোমাদের জন্ম।”

(২)

“এইবার আমার কথা বলিব। আমার নাম কালিন্দী। আমার রূপ নাই ; কেন না, আমার আরশী আছে, সে মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে আমি জানি ; তাই বলিতেছি, আমার রূপ নাই। আমার কপাল আছে, কপোল আছে, নাক আছে, কাণ আছে, ওষ্ঠ আছে, চক্ষু আছে, অধর আছে, চিবুক আছে, কক্ষ আছে, বক্ষ আছে, শ্রোণী আছে, জানু আছে, সবই আছে, কিন্তু রূপ নাই। সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে কামিনীর যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, আমার সে সব আছে, কেবল নাই রূপ ;—তাই আমার নাম কালিন্দী। এ বয়সে গর্দ্দভীর রূপ থাকে, অশ্বীরও রূপ থাকে, মানুষীর ত থাকিবারই কথা ; কিন্তু আমার নাই।—নাই বলিয়া তোমরা পুরুষ-পাঠক আমার এই রূপের কথা পাঠ না কর, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব না। এই দুর্ভিক্ষের দিনে, প্লাবনের পীড়নে, পূজার ধূমে, ম্যালেরিয়ার মরসুমে, তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিবার আমার সাধ নাই ;—তাই আমার দুঃখও নাই।

“আমার রংটা কাল, জুতার বুরুষের মত কাল নহে, রাণী-গঞ্জের কয়লার চাপের মত কাল নহে, বাবুর মাথার পোমেটম্-মাথা চুলের মত কাল নহে, বাঙ্গালার জনকয়েক নাম-জাদা সাহিত্য-সেবীর গায়ের চামড়ার মত কাল নহে ; আমার কাল রং আমারই মত কাল। যখন তোমাদের গৃহিণী পূজার সময় অলঙ্কারের ফরমাইস করিয়া রোষবিকাশ করেন, তখন তোমরা

যেমন কক্ষপূর্ণ অন্ধকার দেখ, আমার রংটাও তেমনি অন্ধকার-মাখান।”

“বলা বাহুল্য, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন কি না, সে সংবাদ লইবার আমার অবসর নাই। তবে তিনি আমাকে প্রায়ই পাকানেবু-রঙের বা জাফ্রাণের রঙের বোম্বাই-শাড়ী এই পূজার সময় খরিদ করিয়া দেন; কাজেই আমি ভাবি আমি কাল। আর আদর সোহাগের কথা যদি বল, পুরুষ ত সে সব কারে পড়িয়াই করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার মূল্য নাই। আমার নাম কালিন্দী, আমার নিবাস কালীঘাটে, আমার পিতা কালী ঘোষ, আমার স্বামী কালাচাঁদ,—আমি কাল নই? বিশেষ ইংরেজের আমলে আমাদের দেশটা কালা আদমীর দেশ হইয়াছে। কালা-কুলীর ঘরণী, কালিন্দী হইবেই ত! ভগিনি পাঠিকে! (চটিও না ভাই) তোমরা পুরুষের মন-মজান কথায় আত্মহারা হইয়া আছ, আমার এ কাটা-কাটা বুলি তোমাদের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু সময়বিশেষে সত্য কথা শুনিয়া রাখা ভাল। আমি কুরূপা!”

(৩)

“স্বামী আমার উকীল। পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ী আসিয়াছেন, আসিয়াই থিয়েটার দেখিবার ঝোঁক হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্যালিকা, শ্যালকজায়া প্রভৃতির তাঁহার উপর একটা অধিকার আছে, সেই অধিকারস্বত্বে আব্দারও চলে, সেই আব্দার রক্ষা করিবার জন্য থিয়েটার দেখিবার কথা স্থির হইল। আমরা “কৃপণের ধন” অভিনয় দেখিতে যাইব, দুইখানি গাড়ীও ভাড়া করা হইল; একখানিতে বালক-বালিকা ও প্রবীণারা যাইবেন,

অন্যখানিতে আমি, ছোট-দিদি, মেজ-বউ, আর আমার স্বামী, এই কয়জন যাইব; এই ব্যবস্থামত দুইখানি গাড়ীও ছাড়িল। কালীঘাট হইতে হাতীর বাগান বহুদূর, ঘোড়ার গাড়ীতে যাইলেও এক ঘণ্টা লাগে। এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কুরূপা; কেন না, আমার অবগুণ্ঠন ছিল না, বিশেষ আমার অবগুণ্ঠনের অন্তরালস্থিত আমার যাবৎ বৈভবই আমার স্বামীর সুপরিচিত। আর মেজ-বউ, ঘোম্‌টা টানিয়া মুচ্‌কি হাসির চন্দ্রিকা ছড়াইয়া নন্দাইএর সম্মুখে গাড়ীতে বসিয়াছে, সে ত কখনও মুকুরে মুখ দেখে না, তাই তাহার লাবণ্যধারা ক্ষণে ক্ষণে নবশিশিরসিক্তা শেফালীর ন্যায় চারিদিকে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আমার স্বামী বুঝিয়াছিলেন সে সুন্দরী, তাই আমিও বুঝিয়াছিলাম সে রূপসী —লাবণ্যময়ী। বিশেষ আমি ভয়বিহ্বলা হইয়াছিলাম,—আমার 'কৃপণের ধন' হারাইবার ভয়ে দিশেহারা হইয়াছিলাম, তাই সে রাত্রে মেজ-বউকে অত সুন্দর দেখি। সুতরাং আমি যে কুরূপা, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

"পরদিন প্রাতে আমার স্বামী ট্রঙ্ক খুলিয়া আমাকে একখানি বেণারসী কাপড় দিলেন, সে কাপড়ের রং বসন্তি; একটি ভাল মখমলের সল্মার কাজকরা বডি দিলেন, মখমলের রং বেগুণে; আমি বুঝিলাম আমি কাল।"

(৪)

"দেবীপক্ষের পূর্ব্বে অপরপক্ষ বা তর্পণপক্ষ,—কেন হয় জান? আমি দাসী হইলেও দেবীর মর্ম্ম বুঝি, তাই সে কথাটা আগে বলি। এখন যে রকম ঘরে ঘরে দেবীর পূজা হয়, তাহাতে পিতৃপুরুষের শুষ্কমুখে তিলাঞ্জলিদানটা পূর্ব্বেই করিয়া রাখা ভাল! নইলে

সে কাজটা সারা বছর আর হইবে না, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিলে হওয়া সম্ভবও নয়। দেবীর আরাধনা শুক্লপক্ষে হয়, তাই গৃহদেবী যাহাই হউন না কেন—তিনি চারুচন্দ্রিকাদীপ্তিময়ী, আর পিতৃকার্য্য কৃষ্ণপক্ষে হয়—কালা আদমীর কার্য্য কি না!"

"পূজা আসিয়াছে, স্বামীও নিকটে আসিয়াছেন, জেলা-আদালতের ছুটিও একমাসব্যাপী, কিন্তু ঐ দেখ না, তিনি দার-জিলিং যাইবেন বলিয়া গ্লাডষ্টোন ব্যাগে কাপড় গুছাইতেছেন। তবে কেন না বলি আমি কুরূপা! দারজিলিঙ্গে চির-তুহিন-বিমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, তুহিনধবলকান্তি বিদেশিনী বিহার করিতেছে, সে দেশে পুরুষ যাইবে না কেন? আবার এখনও কি বলিব আমি কুরূপা!"

"কিন্তু আমার রূপ আছে। সে রূপ আমার রূপ, কি আমার অবগুণ্ঠনের রূপ, জানি না; কিন্তু পাড়ার অনেক নর্কটই অবগুণ্ঠন-বতী আমার প্রতি কি জানি কেমন ভাবে মাঝে মাঝে তাকাইয়া থাকে। যখন তাকায়, তখন আমাতে দেখিবার কিছু আছেই। পুরুষের রূপ দেখিবারই আকাঙ্ক্ষা;—যখন আমাকে দেখিয়া রূপের অন্বেষণ করে, তখন বোধ হয়, আমাতে রূপ আছে। কিন্তু সে রূপ আমার স্বামীর দৃষ্টিতে বি—রূপ, কাজেই ভয় হয়, আমার রূপ নাই!"

"রূপের কথা এত বলিলাম কেন, জান? পুরুষ-লিখিত নাটক নভেল প্রভৃতি সকল পুস্তকেই স্ত্রীলোকের রূপ-বর্ণনার বাহুল্য দেখা যায়। আর আমার এই কামিনী-কলম-কলঙ্কিত কালিন্দী-কথায় রূপের উল্লেখ কেন না থাকিবে! পুরুষ নিজের রূপের বর্ণনা করে না, আমি কিন্তু আমার রূপের বর্ণনা করিলাম।"

(৫)

"স্বামী দারজিলিং গিয়াছেন। আজ পূজার পঞ্চমী; পোটো, মায়ের মুখে ঘামতেল মাখাইতেছে, ফরাস পা'ল টাঙ্গাইতেছে, পূজার দালান পরিষ্কৃত পরিমার্জ্জিত হইতেছে, বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত, কাজ নাই কেবল আমার। আমি পুত্রবতী নহি, আমার বড়দাদা বিপত্নীক, তাঁহার পুত্র নাই, মেজবউ আমার মতন,—মেজদাদা এখনও বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরেন নাই; সুতরাং আমাদের কাহারই কোন কাজ নাই। পূজার কার্য্যে জেঠাইমা, খুড়ীমা, মা,—বর্ষীয়সী সকলেই ব্যস্ত আছেন, আমরা নিজেদের বয়স লইয়া বসিয়া আছি, কাজেই বলিতে হয়, আমি কুরূপা। মেজ-বউএর খবর কেন দিব, সে নিজের ভাবেই নিজে মগ্ন আছে। আর যদি মেজদাদা বাড়ী আসিয়া দারজিলিং বেড়াইতে যাইত, তাহা হইলে বলিতাম, মেজ বউও কুরূপা।"

"পঞ্চমীর সন্ধ্যার সময় মেজ-বউএর নামে একখানি পত্র আসিল। লেফাফার উপর হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কারণ সে হস্তাক্ষর আমার স্বামীর। পত্রখানি পাঠ করিয়া মেজ-বউ আমাকে দেখাইল, আমি কুরূপা কালিন্দী বলিয়াই দেখাইল। পত্রে লেখা আছে, 'মেজ-বউ, আসিবার সময় তোমার মুখখানি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তোমায় কিছু দিয়া আসিতে পারি নাই, অপরাধ লইও না, দারজিলিং হইতে কোন্ সামগ্রী লইয়া যাইলে তুমি সুখী হও, পত্রপাঠ আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। বল দেখি ভাই, এখনও কি আমি সুন্দরী!"

"পরদিন ষষ্ঠীর প্রাতঃকালে নগেন্দ্র আমাদের বাড়ী আসিল।

নগেন্দ্র আমার শ্বশুরের প্রতিপালিত দরিদ্র-সন্তান, দূরসম্পর্কে শ্বশুরের ভাগিনেয়। নগু ঠাকুরপো আসিয়াই হাতমুখ না ধুইয়াই আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, বউঠাকৃরুণ, আপনাকে আজ আমার সঙ্গে সুখচরে যাইতে হইবে, আমি টানা গাড়ীতে লইয়া যাইব।' এ কথার উপর উত্তর নাই, হিন্দুরমণীর শ্বশুর-গৃহই সর্ব্বস্ব, সুতরাং আমাকে সেই দিনেই যাইতে হইল।"

"আবার সেই ঘোড়ার গাড়ী! একদিন সন্ধ্যার সময় এই ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মেজ-বউকে বড় সুন্দরী দেখিয়াছিলাম, আর আজ অপরাহ্নে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া নগেন্দ্রকে অতি সুন্দর দেখিতেছি। এক একবার মনে হইতেছে যে, আমার এই পাশ-ঢাকা কুরূপ কোথাকার মলয়পবনের ফুৎকারে যেন নূতন ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।"

"কেন এমন হয়?—অতি-পরিচয়ে রূপের অভাব-বোধ, অপরিচিতের কাছে রূপের এমন প্রভাববোধ—কেন হয়? পথে যাইতে যাইতে নগেন্দ্র একবার আমাকে বলিয়াছিল, 'বউ, তোমার নাম কালিন্দী কেন হইল, তোমার ত বেশ রূপ, দাদাই বা দার্জিলিং গেলেন কেন? এই কথাগুলি শুনিয়া শুষ্কভূমিতে জলবিন্দুপাতের মত কি-যেন-একটা স্নেহসিক্ত শীতল ভাব হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমি মরিলাম—রূপে মরিলাম, মোহে মরিলাম, ক্ষোভেও মরিলাম।"

"পূজার তিন দিন শ্বশুর-গৃহে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইল; আর বাড়ীর সকলে আমার রূপের ব্যাখা করিতে লাগিল। আমার শাশুড়ী পাড়া-প্রতিবেশিনীগণের কাছে কেবলই বলেন 'বউমার আমার কেমন মাজা রং, কেমন মানান-সই গড়ন, ধীর

চলন, বড় বড় চোখ, পাতলা পাতলা ঠোঁট, আর অষ্ট প্রহরই ভয়ে যেন জড়সড় হইয়া আছে। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' আমি শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বের মত আরশীতে মুখ দেখিতে ভুলিয়া গেলাম, শাশুড়ীর দেখান প্রতিবিম্ব অহরহ আমার নয়ন-কোণে নাচিতে লাগিল। আর নগেন্দ্র?—সে কেবলই আমার প্রতি চাহিয়া থাকে, একগলা ঘোমটার মধ্য হইতে সে দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝিতে পারি। তবে কি আমি রূপসী!—না, না—আমি পোড়ার মুখী!"

"সকলের পকেটে ঘড়ী থাকে, কিন্তু সকলের ঘড়ী এক যায় না, একটু তফাৎ চলে। সকলের কপালের উপর এক জোড়া চক্ষু আছে, কিন্তু সকলের চক্ষুই এক সামগ্রী এক সময়ে এক দেখে না—একটু তফাৎ দেখে। আমার রূপও কাপড় ঢাকা বলিয়া সকলে সমান দেখিত না;—আমার স্বামী যাহা দেখিতেন, নগেন্দ্র তাহা দেখিত না; আমার মা যাহা দেখিতেন, আমার শাশুড়ী তাহা দেখিতেন না। গোল ত এইখানেই;—সর্ব্বনাশ ত এই বৈষম্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বৈষম্যই মনুষ্যসমাজের ব্যবস্থা, বৈষম্যবৈচিত্র্য লইয়াই মনুষ্যচরিত্রের পুষ্টি। আমার পোড়া কপাল যে, আমি মানুষ, রক্তমাংস দিয়াই আমার দেহ গঠিত।"

"আর আমার রক্তমাংসের দেবতা, আমার ভিক্ষার ঝুলি, দরিদ্রের ছিন্ন-কন্থা, পিপাসিত পথিকের জলপাত্র, অন্ধের যষ্টি, ইহকালের ঐশ্বর্য্য, পরকালের সুখ,—আমার স্বামী এখন দার্জ্জিলিঙ্গে। আমার খেলাঘরের পুতুল, বাক্সের আতরের শিশি, চক্ষের অঞ্জন, সীমন্তের সিন্দূর, অঞ্চলের চাবি, হৃদয়ের নিধি,—আমার স্বামী এখন দার্জ্জিলিঙ্গে। আর আমি বাপের আদরের

মেয়ে, শাশুড়ীর সোহাগের বধূ, প্রতিবেশিনীর গৌরবের ধন, নগেন্দ্রের ঈপ্সিত পারিজাতকুসুম—আমি সোহাগে গলিয়া নর্দ্দমায় গড়াইয়া পড়িলাম। আকাশের শিশিরবিন্দু হইয়া ক্লেদ-কর্দ্দমে মিশিলাম !”

(৬)

“যাহা আমার নয়, তাহাই কি মিষ্ট? যাহা পূর্ব্বে পাই নাই, তাহাই ত অপূর্ব্ব। মেজ-বউ আমার স্বামীর দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব, আর আমি আমার দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব, তাই আমার সর্ব্বস্ব, আমি ধূলিমুষ্টির ন্যায় বায়ুপ্রবাহের মুখে উড়াইয়া দিয়াছি।”

“যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে, যাহা নিয়তিতে ছিল, তাহাই হইয়াছে।”

“কিন্তু এমন কেন হয়? তোমরা পুরুষ, তোমাদের জন্য সংসার, তোমাদের জন্য আমরা—তোমরা কেন এমন হইতে দাও? নাটের গুরু নটবর কখন ফুল মাথায় রাখে, কখন বা সেই ফুল ছিঁড়িয়া দেখে,—আমাকে এখন সংসার ছিঁড়িয়া দেখিতেছে। ছেঁড় তোমরা, দেখও তোমরা, শেষে নিন্দা করও তোমরা। আর সেই নিন্দার প্রতিশোধস্বরূপ প্রেতিনীর আকার ধারণ করিয়া আমরা সমাজের স্কন্ধে অজমুণ্ড বসাইয়া দিই, আর মনুষ্যমস্তকটি লইয়া চিবাইয়া খাই। দোষ কাহার? দোষ ত আমার নয়। আমি সংসারে ছিলাম, এখনও আছি,—আমাকে সংসার যেমন করিয়া গড়িয়াছে, আমি তেমনই হইয়াছি। যে সংসারে আমার স্বামীর স্থান ছিল, সেই সংসারে নগেন্দ্রও ছিল; যে সংসারে আমার মা ছিলেন, সেই সংসারে

আমার শ্বশ্রূও ছিলেন, আর সেই সংসারে আমিও আছি। তাই কি আমি এমন হইলাম?"

"তোমরা সকলে হাততালি দিয়া আমাদের নাচাইও না—নাচিতে আরম্ভ করিলে আমরা সমাজ-হৃদয়কে মথিত করিয়া ফেলিব।"

"আমাদের ভরসা শ্রীগৌরাঙ্গ—কেন না, পতিতের অবলম্বন শ্রীগৌরাঙ্গ। যিনি পিশাচীকে নামসুধাপানে অধিকার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের ত্রাণের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। তোমরাও পতিত—শিক্ষার দোষে, সময়ের দোষে তোমরা পুরুষ-বেশ্যা। বারাঙ্গনার বিলাস-বিভ্রমের বিমূঢ়তায় দিশেহারা;—আর পতিত পুরুষের কামকটাক্ষকজ্জলে আমরা চিরকলঙ্কিনী।"

আমাদের উভয়ের ভরসা কলির কলুষনাশী

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!



মনোরমা।

(১)

"আ মরি মরি! এমন সোণার চাঁপার উপর ভগবান্ কেন বজ্রাঘাত ক'র্লেন। বিধাতার মুখে আগুন, তোকে দেখ্লে আমার প্রাণ কেমন করে।" এই বলিয়া মুখুজ্জেদের বড়বউ মনোরমার গাল টিপিয়া দিলেন। মনোরমা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। পিছু পিছু বড়বউও ছুটিলেন, মনোরমার আঁচল ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কাছে বসাইলেন। আরশী চিরুণী, দড়ি-ফিতা আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার একপিট চুল ধরিয়া দক্ষিণ করের অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা কলাইয়া দিতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে কেশাগ্রভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটাগুলি ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

মনো একটু যেন বিরক্তির ভাবে, কেমন যেন কাতরকণ্ঠে বলিল, 'ছি বউদিদি, কি কর, আমার সঙ্গে আর রঙ্গ কি ভাল

দেখায়? আমি কিসের জন্য চুল বাঁধব, আমার সীঁতেয় ত সিঁদুর পড়্‌বে না, আমার চুলের বাহার দেখ্‌বার ত আর কেউ নাই, আমায় আর জ্বালিও না।" এই বলিয়া মনো ধীরে ধীরে বস্ত্রাঞ্চলে নয়নযুগল ঢাকিল। সম্মুখে মুকুর, সে মুকুরে মনোরমার শ্বেতবস্ত্রাবৃত মুখমণ্ডল শরতের শাদা-মেঘ-ঢাকা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইল। পশ্চাৎ হইতে মুখুয্যেদের বড়বউ সে প্রতিবিম্ব দেখিলেন; দেখিয়া বুঝিলেন যে, মনোরমা কাঁদিতেছে, অমনি তাঁহারও বড় বড় দুইটি চক্ষুর কোণ হইতে দুইটি মুক্তাবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। সে বিন্দুর পশ্চাতে আরও অগণিত বিন্দু মালাকারে গড়াইয়া আসিতে লাগিল। বড়বধূও কাঁদিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া মনোরমার কেশবিন্যাসকার্য্য হইতে বিরত হইলেন না। কহিলেন, "মনি, তোর এত চুল, আমি হাতে আঁক্‌ড়ে পাইনে যে, হা ভগবান্!"

মনো। ও চুল পুড়িয়ে ফেল্‌ব বউদিদি, বাবা মাথা মুড়োতে দিলেন না, মা এ চুল ছাঁটিয়া দিতে পারিলেন না; এখন দেখ্‌চি, আমাকেই এ চুলে কাঁচি বসাইতে হবে।

বউ। বিধবা হ'লে মেয়ে-মানুষ মরে না কেন? তুই যদি মর্‌তিস্, আমি কাঁদতুম্, কিন্তু সে একদিনের জন্য; এখন নিত্য দেখিব, নিত্য কাঁদিব; রাবণের চিতা আর কাকে বলে, তোরাই রাবণের চিতা।

মনো। তোমাদের দীর্ঘনিশ্বাস এই রাবণের চিতার অনুকূল বায়ু, তোমার চক্ষের জল ইহার ঘৃতাহুতি, আর এই কেশবিন্যাস চিতায় ধূপ-ধূনার প্রক্ষেপ। কেমন নয় কি?

বড়বধূ আর কথা কহিলেন না। মনোরমার আজানু-

বিলম্বিত কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া একটি অপূর্ব্ব খোঁপা বসাইয়া দিলেন। মনোরমা অব্যাহতি পাইল, ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

(২)

শ্রীযুক্ত রামবন্ধু মুখোপাধ্যায় যোত্রবান্ গৃহস্থ, সুব্রাহ্মণ, সদাচারী এবং দাতা। গ্রামের সকলেই বলিতেন, মুখুয্যে মহাশয়ের পুণ্যের সংসার; এমন কি, যদি কোন প্রতিবেশী অতি প্রত্যূষে মুখুয্যে মহাশয়ের দর্শন লাভ করিত, তাহা হইলে মনে মনে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিত,—ভাবিত, আজিকার দিনটি ভাল যাইবে। কিন্তু পুণ্যের সংসার হইলে কি হয়, বিধাতার নিকট পাপপুণ্যের বাছাই-বিচার নাই। মুখুয্যে মহাশয় সংসারসুখে বঞ্চিত ছিলেন; তাঁহার তিন পুত্র, কিন্তু দুইটি নিরুদ্দেশ; জ্যেষ্ঠ জন্মান্ধ, তাই সে গৃহে আছে; এক-মাত্র কন্যা মনোরমা সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে। সংসারসুখ যদি পুণ্যের ফলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে মুখুয্যে মহাশয়ের পুণ্যকে পুণ্য বলিয়া গণনা করা চলে না; কিন্তু স্বয়ং মুখুয্যে মহাশয় এই সকল সংসারদুঃখে কখনই ক্লেশ বোধ করিতেন না। তিনি সংসারের কোন কথাই কাহারও সহিত কহিতেন না, সে প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কখনই চিন্তার শ্যামচ্ছায়া পড়িত না, ঘড়ির কাঁটার মত নির্দ্দিষ্টকালে পূজা-আহ্নিক সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন, পুরাণ পাঠ করিতেন এবং বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

সন্ধ্যাকাল। গৃহস্থ-গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, মুখুয্যে মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া দুর্গার স্তব পাঠ

করিতেছেন, এমন সময় গৃহিণী ঠাকুরাণী তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলেন, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখে স্তবপাঠ শুনিলেন। শেষে উভয়ে জগদম্বার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

"একি! তুমি যে! তুমি কখন এলে! দুর্গাপদকে জল-খাবার দিয়েছ! বউমা খাবার খেয়েচেন? মোনা কোথায়? তার খাবারের একটু বিশেষ আয়োজন হয়েছে? আজ যে দশমী।" উপর্য্যুপরি এতগুলি প্রশ্ন করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় নীরব হইলেন, গৃহিণী কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, ধীর ভ্রমরগুঞ্জন হইতে তীব্র কেকারবকে পর্য্যন্ত সে রোদন-ধ্বনি ছাড়াইয়া উঠিল, সে ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে সমগ্র-পল্লী পরিপূর্ণ হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থির হইলেন, ভাঙা-গলায় বলিলেন, "তুমি দেখ্‌চি আমায় দেশছাড়া ক'র্‌বে, শ্যামাপদ ও বামাপদ যে পথে গিয়াছে, আমাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। যা হবার তা ত হয়ে গিয়েছে। পূর্ব্বজন্মে উভয়ে অনেক অসৎকর্ম্ম ক'রেছি, সে কর্ম্মভোগ এ জন্মে ভুগ্‌চি। কেঁদে আর ক'র্‌বে কি, তোমার কান্না শুন্‌লে মনোরমা যে অস্থির হয়ে প'ড়্‌বে, তার মুখ চেয়ে তুমি স্থির হও, তাকে স্থির কর, আমার সংসারের মান রক্ষা কর।"

গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ওগো, আমি যে আর পারি নে, আমার বুকটা যে কেমন ক'রে ওঠে, পাথর হ'লে ফেটে যেত, মাটি হ'লে ধূল হ'ত, পুরুষ হ'লে হয় ত পাগল হ'ত; মেয়ে-মানুষের শরীর, তাই সব সহ্য হয়।"

মুখুয্যে। মেয়ে যদি খেয়ে প'রে থাক্‌লে তোমার এত সুখ হয়, তবে ওকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও। তাহারা কলিকাতার

বাবু, মনোরমাকে আহার-আচ্ছাদনে সুখে রাখ্‌বে, আর শ্বশুর-বাড়ী থাক্‌লে আমাদের সকল বালাই চুকে যাবে। আমার বয়স হয়েছে, ইষ্টচিন্তা ক'র্‌বার সময় হ'য়েছে, এখন আমি পরের ভাবনা ভাবি কেন? আমি কা'লই কলিকাতায় চিঠি লিখ্‌ব, তারা এসে তাদের বউ নিয়ে যা'ক; যার যা ভাগ্যে আছে, সে তাই ভোগ ক'র্‌বে, আমরা ক'র্‌ব কি।

এই পরামর্শের পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মনোরমার দেবর আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলেন।

(৩)

কলিকাতার বউবাজারের একটি গলিতে মনোরমার শ্বশুর-বাড়ী। মনোরমার শ্বশুরকুল কলিকাতার বুনিয়াদি ব্রাহ্মণবংশ, সমাজে যথেষ্ট মানমর্য্যাদা আছে, জমিদারি হইতেও বৎসরে পর্য্যাপ্ত আয় হয়, বৃহৎ সংসারের সকল অভাব সঙ্কুলান হইয়া যায়।

মনোরমা শ্বশুরগৃহের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, তাঁহার তিন যা' তাঁহার সহিত রহস্যালাপ করিতেছেন।

মনো। দেখাতে পার্‌বি ভাই! তোদের মুখে গল্প শুনে আমার সাধ মেটে না, আমাকে দেখাতেই হবে।

মেজ-যা। দেখিস্‌ লো দেখিস্‌, তোর ত আর এ জীবনে হবে না, তুই দেখেই সাধ মিটিয়ে নে!

বড়-যা। ছি, ও সব কি বিধবাদের দেখ্‌তে আছে। তোরা যেমন অল্‌বড়ে, তাই ঘরের কথা ব'ল্‌চিস্‌। ঐ যে বলে, নূতন কাকে কি খেলে পরে, কেমন হয়ে যায়, তোদের তাই হয়েছে। ছি বোন! তুমি এসব কথায় থেকো না, তুমি জপ-তপ কর, পূজা-

আহ্নিক কর, আর আমাদের ছেলেদের মঙ্গলকামনা কর। ভাঙা-কাঁচের বাটি কি আর জোড়া লাগে!

মনো। না বড় দিদি, তুমি বারণ ক'রো না, আমি দেখ্‌বই, নিত্য নিত্য ওদের আর গালগল্প শুন্‌তে পারি নি। ছোট বউ! আজ ঠাকুরপো যখন ঘরে আস্‌বে, আমায় ডাকিস ত একবার, দেখ্‌তে হবে। "বিষবৃক্ষ" প'ড়ে, "কৃষ্ণকান্তের উইল" প'ড়ে, কিছু বোঝা যায় না; যখন সাধ হয়েছে, তখন সাধ মিটুতেই হবে।

বড়-বা। তবে তুমি মর, যে পোকা আগুনে প'ড়্‌তে চায়, ঘরের সার্‌সি বন্ধ ক'রে রাখ্‌লেও সার্‌সির উপরে ঠোকর মারে, শেষে ঠোক্কর খেয়েই ম'রে যায়। দেখ্‌চি, তোর কপালে তাই আছে। মর্‌তে হয় নিজে মর, আর কাওকে মেরো না, সোণার সংসারে কালী ঢেলো না।

মুখখানি লাল করিয়া মনোরমা কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অনেকক্ষণ কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া বড়বউ উঠিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মেজবউ-ঠাকুরাণীও উঠিয়া গেলেন, কেবল রহিল ছোটবউ। মনোরমা এইবার ধীরে ধীরে বলিল, "ছোটবউ, আমার ঘাড়ে ভূত চেপেচে, আমি দেখ্‌বই। তুই কিছু মনে করিস্‌ নে ভাই, আমার এ সাধটা তোকে পূর্ণ ক'র্‌তেই হবে। আজ রাত্রে আমি ঠিক থাক্‌ব, সিঁড়ির দোরের জান্‌লার কাছে ব'সে আড়ি পেতে সব দেখ্‌ব। ছোট ঠাকুরপোর নূতন বিয়ে হয়েছে, তুইও নূতন ঘর ক'র্‌তে এসেছিস, এই সময়েই ত আড়ি পাত্‌তে হয়, তুই ঘরের প্রদীপ নিবুস্‌নে!

ছোটবধূ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত-মস্তক-সঞ্চালন দ্বারা অভিমত প্রকাশ করিয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

(৪)

মনোরমা শ্বশুরবাড়ী আসিয়া নূতন মানুষ হইয়াছে। সে এখন শাড়ী পরে, বডিস্ গায়ে দেয়, নানাপ্রকার স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে, পঞ্চব্যঞ্জনের সহিত আতপতণ্ডুল, ঘৃতদুগ্ধ, বাদাম-পেস্তা প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে, সন্ধ্যার পর লুচি পরোটা প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে এবং সারাদিন নাটক-নভেল পাঠ করে। তাহার সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু নাই, মণিবন্ধে লৌহবলয় নাই, বাকি সর্ব্বাঙ্গেই সধবার সর্ব্বলক্ষণই বিরাজ করিতেছে।

সঙ্গদোষে—শিক্ষার দোষে মনোরমার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মনোরমার শাশুড়ী, মনোরমাকে বিধবার ব্রহ্মচারিণী-বেশে দেখিতে পারিতেন না। তিনি প্রায় বলিতেন,—সেজ বৌমা থান পরিয়া বেড়াইলে, আমার প্রাণ কেমন করে। আর কয় বৌ যেমন খাইয়া পরিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, সেজ বৌও তেমনি বেড়াক্। যা হবার তা হয়ে গিয়েচে, তাই ব'লে কি খাওয়া-পরা থেকে বঞ্চিত থাকবে!" কাজেই মনোরমার পোয়া বার। সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, যাহা চায় তাহাই পায়। মনোরমা একটু মুখরাও হইয়াছিল, বাটীর ঝি-বৌ তাহাকে কোন বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিয়া বলিলে, সে এক কথার জায়গায় দশ কথা শুনাইয়া দিত, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী প্রায়ই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্য ঝি-বৌদের তিরস্কার করিতেন, কাজেই মনোরমার কোন কথায় কেহ থাকিত না।

জল মাটিতে ঢালিলেই কাদা হয়, আর গড়াইয়া নীচে গিয়া পড়ে। যতক্ষণ জল ধাতুর আধারে বা পাত্রে থাকে, ততক্ষণ নির্ম্মল পানীয় থাকে; কিন্তু একবার পাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িলে উহা

পঙ্কিল হইয়া যায়। মনের প্রবৃত্তি মনের ভিতর লুকাইয়া থাকিলে একরকম থাকে; বহুকাল হৃৎকোটরে লুকান থাকিলে, উহার সকল ময়লা ধীরে ধীরে কাটিয়া যায়, শেষে নির্ম্মল স্বচ্ছ পবিত্র হয়। মনোরমার মনোবৃত্তি এতকাল মনোমধ্যেই লুকান ছিল। কালে উহা স্বচ্ছ এবং পবিত্র হইতে পারিত, কিন্তু মনোরমা বিলাসের পথে প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়া দিল। আর কি রক্ষা আছে? সে প্রবৃত্তি এখন দ্রুতবেগে ধূলিপূর্ণ মাটির উপর দিয়া বহিয়া যাইবে, বিষ্ঠা-চন্দনের বিচার না করিয়া নিজ তরল দেহে সকল সামগ্রীই গলাইয়া মিশাইয়া লইয়া যাইবে, শেষে পাপের চির-লবণাক্ত অনন্ত অম্বুধিতে গিয়া মিশিবে।

মনোরমার আর রক্ষা নাই।

(৫)

অন্ধকার রজনী; এত বড় কলিকাতা-সহরেও সব অন্ধকার। গ্যাসের আলোগুলাও যেন অন্ধকারের সহিত ঠেলাঠেলি করিয়া শেষে অন্ধকারের অঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ এক আধখানা ছ্যাকড়া গাড়ী দূরে বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছে, আর তাহার নানাপ্রকারের ঝঙ্কারশব্দ গৃহস্থের নিস্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া নগরের ঢাকা অন্ধকাররাশিকে যেন সজীব করিতেছে। গলির পথে এক একটা লোক হন্‌হন্‌ করিয়া বেগে যাইতেছে, দ্বিতলের আলোকিত বাতায়ন-পথ হইতে নীচে তাকাইয়া দেখিলে বোধ হইতেছে, যেন এক একটা অন্ধকারপিণ্ড সশব্দে গড়াইয়া যাইতেছে।

সব নিস্তব্ধ, সব অন্ধকার মাথা। কেবল ছোট বধূর কক্ষে আলো জ্বলিতেছে, আর কক্ষ-পার্শ্বে সিঁড়ির দুয়ারে

মনোরমা বসিয়া আছে, তাহার মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। সিঁড়ির দরজার একদিক্‌কার ভিনিসিয়ানের পাকি খোলা আছে, আর মনোরমা পাকির ফাঁকে বড় বড় চক্ষু দুটি রাখিয়া নয়ন-রূপিণী হইয়া বসিয়া আছে।

ধীরে ধীরে কক্ষের দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে একটি কুড়ি বৎসর বয়সের সুন্দর যুবা সে কক্ষে প্রবেশ করিল। ইনিই ছোটবাবু; ছোটবধূ স্বর্ণলতিকার ন্যায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় এলাইয়া শুইয়া আছে, ধীরে ধীরে ছোটবাবু সে লতিকাপার্শ্বে শয়ন করিলেন। গৃহের প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল।

অজগর সর্পের ন্যায় একটি ফুৎকার করিয়া মনো স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। অমন যে চাপ-চাপ অন্ধকার, মনোরমার নয়নদীপ্তিতে সে অন্ধকার যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল। সাপের লেজে পা পড়িলে যেমন গর্জ্জায়, সে যেমন ব্যর্থপ্রয়াসে পাষাণের উপর দংশায়, মনোরমাও তেমনি ঘোর রজনীতে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং বিধাতাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যর্থ অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

মনোরমার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে এইবার বেড়া-আগুনে পুড়িয়া মরিবে।

(৬)

একখানি তিন দাঁড়ের ভাউলিয়া মূলাজোড়ের ঘাট ছাড়াইয়া তীব্রবেগে যাইতেছে; একে জোর দক্ষিণে বাতাস, তার উপর দ্বিতীয়ার কোটাল জোয়ার, তাহার উপর মাঝীরা বাদাম তুলিয়া দিয়াছে, ভাউলিয়া নক্ষত্রবেগে উত্তরদিকে যাইতেছে। ভাউলিয়ার ভিতরে একটি সুন্দর যুবা পুরুষ কাহার জানুর উপর

মাথা দিয়া শুইয়া আছে। ও কে ও? ও যে সেই মনোরমা! মনোরমা অমন শুষ্ক কেন? চক্ষু দুইটি প্রভাহীন, চক্ষের কোলে কালী পড়িয়াছে, সুন্দর সরস অধরযুগল শুকাইয়া ধূলিপূর্ণ হইয়াছে।

যুবক। তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি তোমাকে স্ত্রীর মতনই রাখিব, নানা সুখে সুখী করিয়া রাখিব।

মনো। তুমি যে আমায় বিবাহ করিবে বলিয়াছিলে! আমি তোমার পরিণীতা ভার্য্যা হইয়া থাকিব বলিয়াই, আমার অত সুখের শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

যুবক। তাও কি হয় মনোরমা? আমার গৃহ-সংসার আছে, মাতাপিতা আছেন, আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব আছে, আমাকে সমাজশাসন মানিয়া চলিতে হয়, আমি কি বিবাহ করিতে পারি?

মনো। তবে আমায় আনিলে কেন? আমি সুখে দুঃখে, যৌবনে জরায় তোমার হইয়া থাকিব, আর তুমি আমার হইয়া থাকিবে;—এই আশায় আমি পরকালের ভাবনা ভুলিয়া তোমার সঙ্গে আসিয়াছি।

যুবক। মনোরমা, আমি তোমার; আমার ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি তোমার; ইহার অধিক মানুষ মানুষকে দিতে পারে না!

মনো। পারে বই কি! দিতে জানিলেই পারে। তোমার সংসার-সুখ আমাকে দাও না? আমি আর কিছু চাই না, তোমার সেবিকা হইয়া থাকিব, তোমার বাড়ীর চাকরাণীর কাজ করিব, আমায় এই অধিকারটুকু দাও! আমি আর কিছু চাই না।

যুবক। ইহা আমার ক্ষমতার অতীত; যেখানে আমার মাতা পিতার পবিত্র আসন আছে, সেখানে তোমায় যাইতে দিব কেমন করিয়া? বিশেষ তুমি যে বিধবা!

মনো। তুমি ত বিবাহ কর নাই, ইচ্ছা করিলে তুমি ত বিধবা-বিবাহ করিতে পার। আমাকে বিবাহ কর না কেন? আমি কি তোমার পত্নী হইবার যোগ্য নহি?

যুবক। কেমন করিয়া বলিব! তুমি আমার রূপমগ্ন হইয় বিলাসসুখে সুখী হইবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলে আমিও তোমাকে দেখিয়া কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া একটা দুষ্কর্ম করিয়া ফেলিয়াছি। যখন দুষ্কর্ম করিয়াছি, তখন শেষপর্য্যন্ত দেখিব। সংসারে আসিয়া আমি অনেক অপকর্ম্ম করিলাম। এটাই বা বাকি থাকে কেন! তাই কলেজের লেখা পড়া ছাড়িয়া, বি-এর পরীক্ষার ভাবনা ভুলিয়া তোমাকে লইয়া পলাইয়া যাইতেছি ওকালতি ত পয়সার জন্য! আমার ঢের পয়সা আছে, বাবা যাহা দিয়াছেন, তাহাই ওড়াইতে আমার এ জীবন কাটিয়া যাইবে পয়সা-রোজগারের ভাবনা জন্মান্তরে হইবে। ও সব বাজে কথা রাখ, এস, দুজনে একটু আমোদ করা যা'ক্।

এই বলিয়া যুবক মনোরমার মধ্যদেশ বাহুবেষ্টিত করিল ধীরে ধীরে মনোরমা তাহার হাত খুলিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জানিতাম না, আমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি ইহা অপেক্ষা আমার মরণ ভাল ছিল।"

যুবক। ছি—ছি মনোরমা! কোন্‌টা সৎকর্ম্ম, কোন্‌টা দুষ্কর্ম জান না! ভাল ক'র্‌চি, কি মন্দ ক'র্‌চি তা বোঝ না! আমি জেনে শুনে দুষ্কর্ম্ম করি, কারণ সৎকর্ম্ম করা আমার সামর্থ্যে কুলায় না।

পাপ ও পুণ্য এ দুইটার বিচার কেবল মরণভয় দূর করিবার জন্য। মরণভয় আমার নাই—আমার বয়সের দোষ! এই বয়সে যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিব। তোমায় বড় ভাল লাগিয়াছে, তাই সমাজের কাপুরুষগুলার স্তুতি-নিন্দা উপেক্ষা করিয়া তোমাকে লইয়া যৌবন জোয়ারের উপর ভাসিয়াছি। এ কার্য্যের পরিণাম দুঃখময়, তা আমি বেশ জানি। তবে মরণসুখ ত সকলেরই ভাগ্যে আছে। তাই বলি মনোরমা, এখন এস, দুইজনে দুষ্কর্ম্মের সুখানুভব করিয়া আপাততঃ তৃপ্তি-লাভ করি।

মনোরমা। অমন কথা বলিও না, তুমি রাখিলে আমি থাকিব, তুমি অমন ব্যবহার করিলে আমি আত্মহত্যা করিব। তুমি আমায় বিবাহ কর।

যুবক। সে কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। সুন্দরি, তোমাকে সে কথা বলি নাই, বলিলে তুমি হরিণীর ন্যায় পলাইতে। তুমি বিলাস-মোহে আত্মহারা হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলে! তুমি ত বিমূঢ়া নারী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলে! তোমাকে এখন সোণার খাঁচায় সোণার পাখী করিয়া পুষিয়া রাখিব; তুমি আর কোথায় যাইবে? এখন দিনকয়েক আমার সাধ মিটাও, পরে যা ইচ্ছা—তা করিও।

(৭)

হুগলী ঘোলা-ঘাটের নিকট সেই ভাউলিয়া বাঁধা আছে, শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ গগনপ্রান্তে ডুবিয়া গিয়াছে, মাঝিমাল্লা সকলেই শুইয়াছে, যুবক মদ্যপানে বিভোর হইয়া ভাউলিয়ার মধ্যে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। মনোরমা বাহিরে আসিয়া

দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রকাণ্ড জুবিলী-ব্রিজ অন্ধকারের রেখার মত দেখা যাইতেছে, মনোরমা সেই কঠিন ঘন অন্ধকার-রেখাই দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া বুঝিল যে, প্রবৃত্তির খরতর প্রবাহের উপর সেতু বাঁধিতে হইলে কত কঠোরতার প্রয়োজন, কত বিদ্যা-সাধনার প্রয়োজন! সংসারক্ষেত্রে আসিয়া সকলকেই কিছু নদীপ্রবাহকে বাঁধিতে হয় না। যাহারা বিধবা, যাহারা যতি-ব্রহ্মচারী, তাহাদিগকেই এই এঞ্জিনীয়ারির উৎকট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। সিদ্ধি ত দূরের কথা, মনোরমা সাধনার চেষ্টাতেই ভীত হইয়াছিল এবং প্রবৃত্তির ললিত তরলপ্রবাহ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় উহাতে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিল। মনোরমা মৃৎপিণ্ড নহে যে, গলিয়া জলে মিশিয়া যাইবে; সে নবীন সরস তৃণখণ্ডমাত্র, তাই ডুবিয়াও ডুবে নাই।

মনোরমা এই প্রকারের অনেক ভাবনা ভাবিল, শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার মরণই ভাল, আমি যে সুখের আশায় আসিয়াছিলাম, সে সুখও পাইলাম না। আর যে সুখ পাইয়াছি, সে সুখ ক্ষণিকমাত্র, সে সুখে দুঃখই অধিক। সমাজ আমার বিরোধী, শাস্ত্র আমার বিরোধী। আমার ইহকালও গেল, পরকালও গেল, মা গঙ্গা তুমি আমায় স্থান দাও, আমার হৃদ্গত রাবণের চিতা নির্ব্বাপিত কর।" এই বলিয়া মনোরমা সেই তরঙ্গ-ভঙ্গময় গঙ্গাপ্রবাহে ঝম্পপ্রদান করিল। তরল অন্ধকাররাশিকে যেন উচ্ছ্বলিত করিয়া গঙ্গাবক্ষে একটা কাতর শব্দ হইল। বিস্মৃতির অন্ধকারে—বিস্মৃতির তরলপ্রবাহে ক্ষণকাল পরে সব ঢাকিয়া গেল।

ভাউলিয়ায় আর এক বিস্মৃতি ;—অবসাদের, বিলাসমাদকতার বিস্মৃতি। যুবক কি সুখের আশায় মাদকতার ঘোরে আচ্ছন্ন আছে? সে ত স্বেচ্ছায় মনোরমাকে লইয়া গঙ্গা-প্রবাহে ভাসে নাই! মনোরমাই তাহার লালসার চুল্লীতে বিলাসের ইন্ধন যোগাইয়া দিয়াছিল। যখন সে বহ্নি শতজিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন অনভিজ্ঞ যুবক তাপের জ্বালায় অস্থির হইয়াই কি মাদকতার ঘোরে স্মৃতির দুঃখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? কে জানে কি? তবে উভয় পক্ষই বিস্মৃতির সহায়তা লইয়াছে। মনোরমা প্রকৃতির গূঢ় অন্ধকারে, বিস্মৃতির দুর্নিবার্য্য তমিস্রায় স্মৃতির ব্যথা ডুবাইয়া চিরদিনের জন্য জ্বালা জুড়াইল, লম্পট অতৃপ্তির তীব্রতা বর্দ্ধিত করিবার জন্য, বিলাসের অবসাদ দূর করিবার জন্য বিস্মৃতির দুর্জ্ঞেয় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিল! যুবক আবার উঠিবে—আবার মাতিবে; তাহার লাটাইয়ের সূতা এখনও শেষ হয় নাই, তাহার প্রবৃত্তির ঘুড়ী এখনও লাট্ খাইবে। তবুও সে বিস্মৃতি চায়!

কোন্‌টা ভাল?—মনোরমার চিরনিদ্রার ব্যবস্থা, না যুবকের ক্ষণিক বিরামের ব্যবস্থা?

ফুল-কুমারী।

"আমি রূপসী ;—এত রূপ, এতই লাবণ্যপ্রভা যে, আমার জন্য আমার শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ সদাই ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকেন। আমি খিড়্‌কির পুকুরঘাটে কাপড় কাচিতে যাইলে শাশুড়ী সঙ্গে যান, আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাতের উপর উঠিলে, ননদ তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপস্বরে আমাকে বারণ করেন। সার্কাস দেখিতে যাইবার আমার অনুমতি নাই ; আজন্ম কলিকাতায় রহিলাম, কখনও থিয়েটার দেখিলাম না।

আর অমার স্বামী,—তিনি ত কেবল অনিমিষনয়নে আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন, আমার চুল দেখিতেছেন, চোখ দেখিতে-ছেন, আমার হাতের আঙুলগুলি লইয়া নিশিদিন খেলা করিতেছেন, আমার রূপের জ্বালায় তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়াছে ; তিনি চাকরির চেষ্টা করেন না, বন্ধুবান্ধবের সহিত

সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেও যান না। মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত নির্নিমেষ-নয়নে কেবল আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন, আমার রূপ তাঁহার পক্ষে কাল হইয়াছে।”

(২)

আমার রূপ আমার পক্ষেও কাল হইয়াছে। ঘেরাটোপ-ঢাকা পিঞ্জরাবদ্ধ বুলবুলীর মত মানুষ কি চিরকাল থাকিতে পারে? রান্নাঘরে যাইবার আমার অনুমতি নাই;—পাছে বামুনঠাকুর আমায় দেখিয়া ফেলে। সংসারে এটা-ওটা-সেটা বাজে-কাজ করিবার আমার অধিকার নাই;—পাছে খানসামারা আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়।

স্বামিসেবাও আমি করিতে পারি না, কারণ বলিতে লজ্জা করে, স্বামীই আমার সেবা করেন, সে সেবার পরিচয় কি দিব? —ক্রীতদাসীও যে সেবা করিতে পারে না, আমার ইহকাল ও পরকালের দেবতা হইয়া আমার স্বামী সানন্দচিত্তে সেইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন; শ্বশুরের চরণসেবা করিবার আমার অবসর হয় না, স্বামী আমার কখনই কাছছাড়া হন না; শাশুড়ী ও শ্বশুরের কাছে যাইতে দেন না। আর শাশুড়ীর সেবা—সে ত হইবারই যো নাই, তাঁহার দুই কন্যা অনবরত তাঁহার সেবা করিতেন; আমি কাছে গিয়া বসিলে তিনি আমার চিবুক ধরিয়া বলেন, “মা আমার ভুবনমোহিনী, দেহটা যেন ননী দিয়ে গড়ান, তুমি মা আমার কি সেবা করিবে? তোমার সেবা করিবার বয়স হউক, তখন করিও, এখন ঘরে গিয়ে ব’স, আমার ঘর আলো ক’রে থাক, নইলে পরেশ রাগ করিবে, তুমি মা পরেশেরই সেবা কর।” শাশুড়ীর এই সকল কথা শুনিলে আমার হাসি পাইত, তাঁহার

পরেশের সেবা দূরে থাকুক, পরেশই সেবা করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।”

(৩)

“ছাই রূপ! এ রূপ আমার কেন হইল? আমার খাইতে সোয়াস্তি নাই, বসিতে সোয়াস্তি নাই, সাধ-সখ মিটাইবার উপায় নাই; দশটা স্থানে যাইয়া দশরকম সামগ্রী দেখিবারও অনুমতি নাই। দুই বেলা দুই-পাথর ভাত খাই, তাহা হজম করিবার জন্য সংসারে দশটা পরিশ্রমের কাজ করিবারও অবসর নাই। এমন ভাবে কি মানুষ বাঁচিতে পারে? আর স্বামী! তিনি ত স্বামীই নন,—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীলোকের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়, স্বামীর সহিত কুলাঙ্গনা যে সকল আমোদ আহ্লাদ করিয়া সুখী হয়, আমার তাহার কিছুই হয় নাই। স্বামী কেবলই আমায় দেখিতে-ছেন, চাঁদের আলোয় দেখিতেছেন, বাতির আলোয় দেখিতেছেন, বিদ্যুতের অলোয় দেখিতেছেন; প্রথম প্রভাত-আলোয় দেখিতে-ছেন, প্রদোষকালেও দেখিতেছেন; আর নানা রঙের নানা রকমের কাপড় পরাইয়া, আমার রূপের প্রভা দেখিতেছেন। এত দেখা কি আমার সহ্য হয়? আমি দেখিতে পাই কই? আমার সুকান্ত, স্বর্ণবর্ণ, সুগঠিত স্বামিমুখ, আমার নয়ন লইয়া, আমার অবসর মত মনপ্রাণ এক করিয়া আমি দেখিতে পাই কই? কেবল যদি দেখাইব, কেবল যদি নিজের রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকিব, তবে আমার দেখার সাধ মিটিবে কেমন করিয়া?

হায়! হায়! এ পোড়া রূপের জ্বালায় আমার জীবন-যৌবন সবই বৃথা হইল!”

(৪)

"কতবার আমি আরশীতে মুখ দেখিয়াছি! আমার কক্ষ-প্রাচীরের উপর একটা প্রকাণ্ড আরশী টাঙান আছে, আমি নিশিদিন বসিয়া বসিয়া সেই আরশীতে আমার দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি। আমার যেমন নাক-কাণ-চোক আছে, কপোল-কপাল-গণ্ড আছে, উরু-ভূরু-বক্ষ আছে, অন্য সকল স্ত্রীলোকেরও ত তেমনি আছে। গৌরবর্ণটা কিছু আমার একচেটিয়া নহে; আমিই যে পল্লীর মধ্যে সুগঠিতা, তাহাও নহে। আমার মত যুবতী বাঙলা দেশে অনেক আছে, অনেক ছিল, অনেক হইবেও; তবে কোন্ পাপে আমি এমন ভাবে মোহপাশবদ্ধা হরিণীর ন্যায় দুঃখ পাইতেছি? আমার স্বামী বলেন, তাঁহার চক্ষু লইয়া দেখিলে আমি নিজেকে অসামান্যা রূপসী দেখিব; তাহাতে আমার লাভ কি? আর তাহাই কি রূপ? ইহার জন্যই আমার স্বামী পাগল! আমার শাশুড়ী সদাই ত্রস্ত! নিশ্চয় বলিতে পারি, প্রকৃত রূপ আমার দেহে নাই, তাঁহাদের নয়নে আছে। রূপটা কেবল দৈহিক-সামগ্রী হইলে, আমি সে রূপ দেখিয়া আমার স্বামীর মত বিমূঢ়া হইয়া থাকিতাম। কিন্তু রূপ যে নয়নের সামগ্রী! সকলকে দেখিয়া সকলের নয়নে এক-রকম রূপের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে না। মেজঠাকুরপোর বৌ কাল, তিনি সেই কাল বৌ লইয়া বেশ সুখে আছেন, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন; মেজবউকেও ভালবাসেন। মেজঠাকুর-পো ত আমাকে দেখিয়া আমার স্বামীর মত বিহ্বল-মূঢ় হইয়া থাকেন না; কেবল এক এক বার হাসিয়া বলেন, "বড় বউ! রৌদ্রে বাহির হইও না, তোমার

রঙের গোলাপী আভাটুকু শুকাইয়া যাইবে ” পুরুষের মুখে এ সকল কথা, আমরা যুবতী বেশ বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার স্বামীর ভঙ্গিটা বুঝা যায় না, বুঝিয়াও লাভ নাই।

ফলে, ধীরে ধীরে আমার মনে একটা বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিল! এ মোহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মনে মনে একটা সঙ্কল্পও হইল।”

(৫)

আমার শ্বশুর ডেপুটী কালেক্টার, গবর্ণমেণ্টের হুকুমে তিনি আরায় বদলী হইলেন। আমরা সকলেই আরায় যাইলাম। চাটুয্যেবাড়ীর একটি ছেলে শিশুদের পণ্ডিত হইয়া আমাদের সঙ্গে আরায় যাইল। কিছুকাল আরায় আমি বেশ সুখে ছিলাম। নূতন স্থান, নূতন ব্যবস্থা—নবীনত্বে আমি আমোদ পাইলাম, পরন্তু আমার স্বামীর সেই পুরাতন মোহ পূর্ব্ববৎই প্রবল রহিল। আরায় আমি একটি কন্যা প্রসব করিলাম। কন্যার মা হইয়া একটু স্বাধীনতাও আমার লাভ হইয়াছিল।

ছেলেদের পণ্ডিতটির নাম রাজকৃষ্ণ; বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, ঠোঁট দুটি খুব মোটা, চক্ষু দুইটি গোল-গোল, আর দেহ—সে ত লৌহের ভাঁটা—সুসংবদ্ধ, কোমল মাংসপেশীজড়িত, একটুও কোমলত্ব নাই, যেন ঠিক চোয়াড়ে। রাজকৃষ্ণ আমার অনেক কাজ করিত —অনেক ফরমাইস্ খাটিত, আর মাঝে মাঝে আমাকে ধমকাইত; আমি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতাম, একটু ভালও বাসিতাম।

আমার এক ননদের স্বামী গয়ায় মুন্সেফ ছিলেন, আমরা আরায় আসিয়াছি শুনিয়া, বড়দিনের ছুটিতে তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী

আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। মুন্সেফঘরণী আমার এই ননদিনী, আরায় আসিয়া অবধি আমাকে দুই চক্ষের বিষ দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার নিন্দা-পরিবাদ—তিরস্কার-গঞ্জনা প্রথম প্রথম আমার ভাল লাগিত। কেন না, বিবাহ হইয়া অবধি আমি কেবল আদর খাইয়াছি—আদর পাইয়াছি, আদরে আমার বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, তাই ননদের তিরস্কার প্রথম প্রথম ভাল লাগিয়াছিল।

কিন্তু এই ননদিনী শেষে আমার কালস্বরূপিণী হইলেন।"

(৬)

"আমি যে কক্ষে শয়ন করিতাম, সেই কক্ষের পার্শ্বে একটি বাথ্‌রুম্ ছিল। বাথ্‌রুমের পূর্ব্বদিকেই রাজকৃষ্ণের শয়নকক্ষ ছিল। ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নূতন বর্ষের নূতন দিন। আমার স্বামী বাঁকিপুরে গিয়াছেন, আমি এবং আমার প্রখরা ননদিনী, আমরা দুই জনেই কক্ষে শয়ন করিয়া আছি। রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, একটু ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পৌষমাসের শেষ, পশ্চিম বেহারের ভীষণ শীতে আমরা কাঁপিতেছি। আমি একবার বাথ্‌রুমে যাইলাম, ফিরিয়া আসিয়া আগুনের আংটার কাছে আগুন তাপিতে বসিলাম। আমার ননদিনী উঠিলেন, তিনিও বাথ্‌রুমে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "বউ! নাইবার ঘরে এত রাত্রে রাজকৃষ্ণকে দেখিলাম কেন? তুই ত ওখানে গিয়েছিলি?" আমি উত্তর করিলাম, "তুমিও ত গিয়েছিলে ঠাক্‌রুণ! রাজকৃষ্ণ কার জন্য এসেছিল, কে জানে? আর যদিই আমার খোঁজে এসে থাকে, তাতে তোমার ক্ষতি কি? পাঁচ ভায়ের উপর না হয় তোমার আর একটি ভাই হইল।"

আমার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কথা শুনিয়া ননদিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, তীব্রবেগে মায়ের কক্ষের দিকে যাইলেন। উচ্চকণ্ঠে আমার কলঙ্কের কথা মাকে বলিলেন, বাবাকে বলিলেন, বাড়ীতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল।

পরে আমার শাশুড়ী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি বলিলাম, "রাকৃষ্ণকে আমি দেখি নাই।" কিন্তু আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। পরদিন প্রত্যূষে রাজকৃষ্ণের খোঁজ হইল, তাহার কক্ষে তাহাকে কেহ পাইল না, সন্দেহের উপর সন্দেহ হইল। আমার এতদিনের এত আদর, এত সোহাগ, সব এক কলঙ্কের বন্যায় ভাসিয়া গেল। বাঁকিপুর হইতে স্বামী আসিলেন, শ্বশুরমহাশয় তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন, শাশুড়ীঠাকুরাণীও তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "দেখ্ পরেশ! তুই এমন স্ত্রীকে ত্যাগ কর্, আমি অমন কালামুখীকে সংসারে রাখিব না।" শ্বশুর পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার সুন্দরী স্ত্রী যদি ত্যাগ করা কষ্টকর বোধ হয়, তুমি স্ত্রী লইয়া অন্যত্র থাকিতে পার, কিন্তু আমার সংসারে তোমাদের উভয়ের স্থান হইবে না।" আমার ননদিনী বলিলেন, "তা কেন, ও অভাগী দূর হউক, আমি আমার ভায়ের বিবাহ দিব।"

আমার বড় যত্নের রূপের কুসুমস্তবক একেবারেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল!

রাজকৃষ্ণের মনে পাপ ছিল কি না, আমি জানি না। আমি তাহাকে বাথ্রুমে দেখি নাই। তাহাকে ভাল বাসিতাম বটে; অনুগত চাকরকে যে ভাবে স্নেহ করে, আমি সেই ভাবে স্নেহ করিতাম। আমার মনে পাপ ছিল না, কিন্তু আমার ললাটে

পাপের কলঙ্ক-লেখা আছে, আমি মনে যতই সতী হই না কেন, আমার অসতীত্বের নিন্দা চারিদিকে রটিয়া গেল।

স্বামী আমার শয়নকক্ষে আসিলেন, আসিয়াই গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, “ফুল! আজ তোমাকে বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, আমি ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিব। তোমার ভাই আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।”

আমি। আমার কি অপরাধ যে, আমাকে আমার এই আঠার বৎসর বয়সকালে তুমি ত্যাগ করিতেছ, তোমার কন্যা সুবালার মুখের দিকে একবার তাকাও। আমি যা’ব না।

স্বামী। তোমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিবার কথা হইতেছে, আমার সঙ্গে যাইলে তোমার মান থাকিবে! আর দরোয়ানের সঙ্গে তোমাকে তাড়াইয়া দিলে তোমার মান থাকিবে না। আমার কথা শোন, তোমার সামগ্রীপত্র সব গুছাইয়া লও।

আমি। যখন সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, তখন আবার গুছাইব কি? আমি এক বস্ত্রে যাব।

স্বামী। সুবালাকে আমি যে সব জামা-কাপড় খরিদ করিয়া দিয়াছি, তাহা লইয়া যাও; আমাকে কষ্ট দিও না, আমি তোমাকে যে সকল সামগ্রী খরিদ করিয়া দিয়াছি, তুমি তাহাও লইয়া যাও।

আমি। বিবাহের পর ছয় বৎসর আমি তোমার চরণ ধরিবার অবসর পাই নাই, তুমিই দাও নাই! আজ সেই চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল একবার বল, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বল, আমার শিশুকন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বল, আমার মাথায় হাত দিয়া একবার বল,—আমি তোমার দৃষ্টিতে নিরপরাধিনী কি না? তুমি একবার বলিলে

আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে, আমি সকল দুঃখ পাসরিব ;—বল, একবার বল।

স্বামীর চরণ ধরিয়া আমি উর্দ্ধমুখ হইয়া কাঁদিতেছিলাম। আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্বামী ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, দুই করে আমার দুই গণ্ড চাপিয়া ধরিয়া অধরের উপর একটি চুম্বন দিলেন। কোঁচার কাপড়ে আমার নয়নযুগল, কপোল ও বক্ষ মুছাইয়া দিয়া, রোদনের স্বরে বলিলেন, "ফুল! অমন করিয়া কাঁদিও না, তোমার মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, তোমার কথা শুনিলে আমি পাগল হইয়া উঠি ; শেষে কি আফিং খাইয়া মরিব ? ফুল! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ; সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিভববিলাস, জীবনযৌবন—আমার সর্ব্বস্বই তুমি। তুমি সতী, তুমি সাধ্বী ; আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার রূপময়ী ইষ্টদেবী। তোমাকে ছাড়িতে, তোমাকে ত্যাগ করিতে, আমার যে কত কষ্ট হইতেছে, আমার হৃৎপিণ্ড কি ভাবে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তাহা কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব। আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, আমি একদিনেই পঞ্চাশ বৎসরের বুড়া হইয়া পড়িয়াছি!"

আমি। তবে আমায় পায়ে ঠেলিতেছ কেন? প্রভু, চল দু'জনে দেশান্তরে যাই, ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন করি।

স্বামী। ছি! ও কথা বলিতে নাই ; ঈশ্বর নিরাকার অজ্ঞেয় পুরুষ ; কিন্তু এ জগতে মাতা-পিতা সজীব ও সাকার দেবতা। আমার দেবতাই তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন ; তুমি যাহাই হও না কেন, সতী হও, সাধ্বী হও, পতিব্রতা হও—তুমি আমার মাতা-পিতার পরিত্যক্তা, তোমাকে লইয়া আমি

আর সংসারসুখে সুখী হইতে পারিব না। তুমি যাও, মনে করিও, তোমার পরেশ মরিয়াছে, তুমি বিধবা হইয়াছ। আমার এ দেহ আমার নহে, মাতা পিতার। তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন। আমাকে হয় ত আবার বিবাহ করিতে হইবে; ক্ষতস্থানকে ছেদ করিয়া আবার লবণপ্রলেপ দিতে হইবে।

এই কথা বলিয়া স্বামী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় ধূলায় লুটাইয়া পড়িলাম।”

(৮)

“আমি এখন পিত্রালয়ে। আমার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার দুটি পুত্রসন্তান হইয়াছে, তিনি এখন চাকরি করিতেছেন।

আর আমি সধবা হইয়াও বিধবা হইয়া আছি; আমার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে আদর নাই, সে সোহাগ নাই। জীবনের অবলম্বনের মধ্যে আমার কন্যা, সে আমার কাছে আছে, —আর পূর্ব্বেকার সে সুখস্বপ্নের সুখ-স্মৃতি আমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। অতীত জগতে আমার অধিষ্ঠান, আমার পক্ষে বর্ত্তমানও নাই, আর ভবিষ্যৎও নাই।

ছাই রূপ! রূপের জন্যই ত এত হইল! ‘সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।’ আমার রূপের অত্যন্ত আদর হইয়াছিল; তাই সে পোড়া রূপের জন্য আমিই এখন ধূলায় লুটাইতেছি। স্বর্গের দেবতা আমার চরণতলে বসিয়া, আমার মুখেন্দুপ্রভা দেখিতেন, আর এখন আমি, স্বর্গের দ্বার কবে খুলিবে, তাহারই অপেক্ষায় দিন গণিতেছি।

ছাই রূপ! রূপ না থাকিলে হয় ত এতটা হইত না। আমার স্বামী পূর্ব্বে আমার রূপপূজা করিতেন, আর আমি তাঁহার দিবা-

নিশি রূপপূজার ধুম দেখিয়া মনে মনে কেবল বিরক্তি প্রকাশ করিতাম; এখন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি!

রূপের এ তুষানল, রাবণের চিতার ন্যায়, আমার দেহের উপর আমরণ জ্বলিবে। আমি মরিব না, কিন্তু বাঁচিতে পারি কৈ?"



অনুপমা।

(১)

"শ্রীচরণেষু—

"আমাদের বিবাহ হইবার পরে আমি আপনাকে এই প্রথম পত্র লিখিতেছি। আপনি আমাকে দুই তিন খানি পত্র লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে সকল পত্রের উত্তরে এতদিন আমি কিছুই লিখি নাই। কেন লিখি নাই, আজ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব।

"আমরা উভয়ে শুভ পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা, রুচি-প্রবৃত্তির কথা, আমরা পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও বলি নাই। আমাদের দেশের হিন্দু-সমাজের সে রীতি নহে, আমাদের উভয়ের অভিভাবকগণ একটা কিছু ঠাওরাইয়া আমাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর-কন্যায় শুভদৃষ্টিও বিবাহের পূর্ব্বে হয় না; কিন্তু আপনি একবার বন্ধুগণের সহিত লুকাইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি যে রূপসী, সে কথা সে সময়ে পাকে-প্রকারে বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষের কথা তখন বলা-হয় নাই।

"আমার যখন বিবাহ হয়, আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদিগকে মিথ্যা করিয়া বলা হয়, আমার তখন মোট ১৩ বৎসর বয়স। এ মিথ্যার জন্য আমি দায়ী নহি। আপনি জানেন যে, আমাকে একটি মেম লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তিনি ইংরাজরমণী হইলেও,—খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও আমার শিক্ষয়িত্রী, ইষ্টদেবী-স্বরূপিণী। তাঁহারই আদেশক্রমে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমার প্রগল্‌ভতা আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনি উচ্চশিক্ষায় বিমণ্ডিত, উদার প্রকৃতির সাধুপুরুষ। আপনার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিলে, অবশ্যই আপনি মন্দ ভাবিবেন না; আমার দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"আমাদের বিবাহের বহু পূর্ব্বেই আমি শ্রীযুক্ত সিতেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে মনে মনে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলাম। এ কার্য্যে আমার সহায় স্বয়ং ভগবান্ এবং আমার শিক্ষয়িত্রী। সিতেশবাবু যে আমার মনোবাঞ্ছার কথা জানেন না, তাহাও নহে; তিনি আমার নির্ব্বাচনে সুখী হইয়াছিলেন এবং আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কৌলীন্যমর্য্যাদা-শূন্য এবং দরিদ্রের সন্তান। আমার পিতা তাই আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই। আপনি কুলীন, ধনীর পুত্র এবং স্বয়ং শিক্ষিত। তাই আমার পিতা দশ-হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া আপনাকে জামাতার পদে বরণ করিয়াছেন। আপনাদের হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিতে আমি আপনার পত্নী, আপনি আমার স্বামী; কিন্তু যিনি সকল সমাজের সারভূত—সকল

াতির ইষ্টদেবতা—সেই দয়াময় পরমেশ্বরের সিংহাসনের মুখে আমি সিতেশবাবুর স্ত্রী। আপনার প্রণয়লিপির উত্তর িতে হইলে, আমাকে দ্বিচারিণী সাজিতে হয়—আমাকে সয়তানের হকারিণী সাজিতে হয়। রাজার আইন—সমাজের শাসন, সবই আপনার অনুকূল; আপনি আমার দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু আমি ত ভিতরের সকল কথা আপনাকে বলিলাম; যে দয়াময় আপনার আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আপনাকে সুবুদ্ধি দিবেন, তিনিই আপনাকে সৎপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, ইহাই আমার ভরসা। ইতি।"

"ক্ষমার্হা অনুপমা।"

(২)

ভাই পাঠক! হাসিও না; কিন্তু ইহাই আমার প্রথম প্রণয়-লিপি। বড় সাধ করিয়া অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার অনুপম রূপ-মাধুরী দেখিয়া, তাহার হাতে পিয়ানো-বাজান শুনিয়া, তাহার কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া, তাহার মুখে শেলি-বায়রণ, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতাপাঠ শুনিয়া, আমি দিশাহারা—জ্ঞানহারা হইয়া, বড় সোহাগে অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমার হৃদয়-স্বর্গের নন্দন-বনের বনদেবী করিবার জন্য আমার নিষ্কলঙ্ক প্রীতি-পর্য্যঙ্কে অনুপমাকে বসাইয়াছিলাম। কেমন করিয়া বলিব, অনুপমার কত রূপ; সেই ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ দুইটি—সেই চাঁদ-নিঙড়ান চাঁদমাখান স্বচ্ছ কপোলযুগল, সেই অমিয়মাখা কচি কচি ঠোঁট দুইটি,

আর সেই গ্রীবা।—আ মরি! মরি! কুঞ্চিত কেশদাম গ্রীবার উপর পড়িয়া, খোঁপাটি গ্রীবার উপর হেলিয়া থাকিয়া, রাহু-কবলিত অর্দ্ধ-চন্দ্রের ন্যায় অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছিল! আর সেই দেহ-লতিকা!—সত্যসত্যই যেন স্বর্ণলতিকা। শাল কাণ্ড-বিলম্বিতা পুষ্পাভরণ-ভূষিতা বল্লরী যেমন ধীরপবনে ধীরে ধীরে কাঁপিতে থাকে, তেমনি অনুপমার দেহলতা লাবণ্য-কুসুমাভরণা হইয়া সোহাগ-ভরে ধীরে ধীরে যেন সদাই কাঁপিতেছে।

আমি কি পাগল হইব, আমার অনুপমা আমাকে কেন এমন পত্র লিখিল? আমি কি করি! আমি যে সে রূপের লোভ ছাড়িতে পারি না, আমি যে সে রূপের মোহ এড়াইতে পারি না, আমি যে সে রূপের জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি! আমার ওকালতী গিয়াছে, উপার্জ্জন বন্ধ হইয়াছে, লোক-লৌকিকতা উঠিয়াছে, মাতাপিতৃ-সেবা ঘুচিয়াছে,—আমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। আমার রূপের কনক-কটরায় কে এমন হলাহল ঢালিল রে? আমার সুখের কামিনীকুঞ্জে কে এমন করাল ব্যাল ছাড়িয়া দিল রে? আমার বিলাসের চন্দ্রমাক্রোড়ে কে এমন কলঙ্কের শশাঙ্ক বসাইয়া দিল রে?

আমি কি পাগল হইব! পাগল হইবার বাকিই বা কি? পত্রপ্রাপ্তি অবধি আমার আহার-নিদ্রা নাই, সাজ-সজ্জা নাই, রহস্যালাপ নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞানও নাই। ওহো! এ কি রূপের জ্বালা! এ কেমন প্রদাহ! বজ্রসূচিবেধের ন্যায় এ জ্বালা আমার ভিতর পুড়াইয়া খাক্ করিয়া দিতেছে, আমার সরস হৃদয়কে শুকাইয়া বালুকাপূর্ণ ভীষণ মরুতে পরিণত করিতেছে। সত্য-

সত্যই আমি পাগল হইলাম। সেই শিক্ষয়িত্রী ইংরাজরমণী—সে কি রাক্ষসী, সে কি পিশাচী? কেন সে আমার সুখের পথে শ্মশানের অতি উষ্ণ চিতাভস্ম ঢালিয়া দিল? আমি মরিলেই যে বাঁচিতাম!

(৩)

পাগলের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, আমার শৈশব-সুহৃৎ প্রিয়বাবুর নিকট ছুটিয়া যাইলাম; তাঁহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলাম, তিনি একটু মুচ্‌কি হাসিলেন। আমার বড় রাগ হইল। আমার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিয়া প্রিয়বাবু আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "শরৎ! অমন জ্ঞানহারা হইও না, পত্রে এমন মারাত্মক কিছুই নাই। তুমি অনুপমাকে ত ত্যাগ করিতে পারিবে না! ত্যাগ করিবার কথা বলিলে তুমি যে মরিয়া যাইবে! আর অনুপমাও ত্যাগের যোগ্যা নহেন, তিনি অতি রূপসী এবং সুশিক্ষিতা, তাঁহার পত্র শুনিয়া বুঝিলাম, তোমার ন্যায় তিনিও রূপমুগ্ধ এবং ভাববিহ্বলা। সিতেশবাবু সুপুরুষ, সিতেশবাবুর চেহারায় এমন কিছু আছে, যাহা দেখিলে যুবতী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়।"

আমি কাতরভাবে বলিলাম—"উপায়?"

প্রিয়। উপায় আছে বই কি! তোমার বাবাকে বলিয়া অনুপমাকে তোমাদের নিজের বাটীতে আনাও, নিজের কাছে রাখিও না, দমদমার বাগান-বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া দাও। তোমার বৃদ্ধা পিসিমাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে বল, দাসদাসী থাকুক, দরয়ান্‌-বেহারা থাকুক। তিন মাস কাল সে বাগানে

তোমার ছোট ভাই, ভগিনীপতি প্রভৃতি কোন যুবকই যেন না যাইতে পারে। তুমি প্রত্যহ একবার করিয়া যাইবে; আর দেখিও, অনুপমা যেন সিতেশকে কোন পত্র লিখিতে না পারে; আর জানানা-মিশনের সেই শিক্ষায়িত্রী ইংরাজরমণী কিছুতেই যেন অনুপমার সাক্ষাৎ না পায়।

আমি। ইহাতে কি হইবে, জবরদস্তিতে কি কাহাকেও ভালবাসান যায়! জোর করিলে অনুপমা একটা বিপদ্ ঘটাইতে পারে, আত্মহত্যা করিতে পারে।

প্রিয়। তুমি পাগল হইয়াছ, তাই সকল কথা বুঝিতে পারিতেছ না। অনুপমা কেবল লেখা-পড়াই শিখিয়াছে, কেবল গান-বাজনা শিখিয়াছে, আর শিক্ষয়িত্রীর কাছে কেবল নাটক-নভেল পড়িয়াছে; কাব্যগাথা পড়িয়া বিলাতী ফ্রী-লভের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। অনুপমা ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিখে নাই; সমাজতত্ত্ব বুঝে নাই, কর্ত্তব্যাবধারণ করিতেও পারে নাই; কিন্তু অনুপমা হিন্দুগৃহস্থের কন্যা, হিন্দু-সংসারে প্রতিপালিতা। অনুপমার প্রকৃতি হিন্দু-উপাদানে গঠিত, অনুপমার প্রাণ হিঁদুয়ানীতে পূর্ণ। এই পত্রখানি নূতন যৌবনের প্রথম জোয়ারে—নূতন শিক্ষার প্রথম তাড়নায়, রূপবিলাসের মোহে লিখিত। যদি তাহাকে কিছুদিনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রাখা যায়, যদি তাহার বিমূঢ় হিন্দুপ্রকৃতির উন্মেষের পক্ষে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সে আবার তোমারই হইবে। তোমার পিসিমা সে কালের পাকা গিন্নি, তিনি কাছে থাকিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবেন, আর তুমি মাঝে মাঝে এক এক বার দেখা দিয়া আসিও। অনুপমার নূতন যৌবনের প্রখর স্রোতের সরল পথে বিকৃত ভাবের বালির বাঁধ পড়িয়াছে,

তোমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে দেখিতে যুবতীর স্পৃহার প্রবাহ তোমার দিকেই ছুটিয়া আসিবে; তোমার অনুপমা তোমারই হইবে।

আমি। এই উপায়ে কি ভালবাসা ফুটিতে পারে? আমি কেবল অনুপমাকেই চাই না, তাহার ভালবাসাকেও চাই।

প্রিয়। ইংরাজী পড়িয়া তোমারও মাথা বিগড়াইয়াছে। ইংরাজী নাটক-নভেলে যে প্রকার অনুরাগের কথা আছে, সে প্রকারের তীব্র অনুরাগ আমাদের ভাতখেকো বাঙ্গালীসমাজে সম্ভবে না। বিশেষ, সিতেশের প্রতি অনুপমার যে অনুরাগ, তাহা অনুরাগই নহে, সামান্য একটা খেয়ালমাত্র; অহরহ নাটক-নভেল পড়িয়া যুবতীর মনের একটা বিকারমাত্র। বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু প্রকৃতি-বিকৃতির ঔষধ নাই; অনুপমার এই বিকারের যে চিকিৎসা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিলাম। তুমি তিনমাস কাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।

আমি দুরাশার দুষ্ট শ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিলাম, এবং প্রিয়নাথের উপদেশমত সকল ব্যবস্থাই করিলাম।

(৪)

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে, আজ আমার সুপ্রভাত, অনুপমা আজ একখানি পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানি এই—

"ইহজীবনে আমার প্রায়শ্চিত্ত কি শেষ হইবে না? আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল, সে তুষানলজ্বালা আমি ভোগ করিতেছি। জানি না, কি কুক্ষণে পিতা আমার লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—কি কুক্ষণেই আমি মিস ফক্সের ন্যায় শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়াছিলাম! আমার সোণার

সংসার, সুখের ঘরবাড়ী, রাজা শ্বশুর, অন্নপূর্ণাতুল্যা শাশুড়ী, ইন্দ্রতুল্য স্বামী,—আমি পাইয়া হারাইলাম।

"আমার কি অপরাধ! আমায় যেমন শিখাইয়াছিল, তেমনি শিখিয়াছিলাম, যেমন বুঝাইয়াছিল, তেমনি বুঝিয়াছিলাম, আর যাহাকে সামনে পাইয়াছিলাম, তাহাকেই আপন বলিয়া আদর করিয়াছিলাম। আমি নারীমাত্র,—অবলা চিরবিহ্বলা আমার অপরাধের এমন বিষম প্রায়শ্চিত্ত কেন নাথ! আমি ত যুবতী-সুলভ কপটব্যবহার করি নাই! পোড়া বুদ্ধিতে তখন যাহা ভাল বুঝিয়াছিলাম, তোমাকে তাহাই লিখিয়া জানাইয়াছিলাম।

"তুমি স্বামী, আমার দেবতার দেবতা, আমার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব! তুমি দয়া করিয়া তখন আমাকে ত্যাগ কর নাই, তাই আমি এখনও কুলাঙ্গনার পবিত্র আসনের অধিকারিণী হইয়া আছি। যে দয়াপ্রভাবে সে দুঃসময়ে তুমি আমায় রক্ষা করিয়াছিলে, সেই করুণাগুণে তোমার পদপ্রান্তে একটু স্থান কি দিবে না? আমি কাঙালিনী, বনবাসিনী; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন আমি আমার বনবাটিকার বাতায়নপথে বসিয়া থাকি, তখন দেখিতে পাই, তুমি বাগানে পদচালনা করিতেছ, প্রাণে বড় সাধ হয়, একবার ছুটিয়া গিয়া তোমার পদপ্রান্তে পড়ি, আর ঐ চারু চরণযুগল হৃদয়ে ধরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে মনের সকল ব্যথার কথা তোমাকে বলি; কিন্তু আমি যে রমণী, আমার রমণীসুলভ লজ্জা আসিয়া আমার ইচ্ছাপথে বাধা দেয়। আমার হৃদয়ের বাসনা হৃদয়ে উন্মীলিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হয়।

"ছাই লেখাপড়া! আমি যদি লেখাপড়া না শিখিতাম;

আমি যদি নাটক-নভেল না পড়িতাম, তাহা হইলে সেই ফুল-শয্যার রাত্রি হইতেই আমি তোমার সকল সোহাগের অধিকারিণী হইতে পারিতাম।

"রক্ষা কর প্রভু! আমায় রক্ষা কর; তুমি না রাখিলে আমায় কে রাখিবে? তুমি আমার লজ্জা-নিবারণ, বিপদ্‌ভঞ্জন; তুমি আমার এই তুচ্ছ নারীজীবনে ত্রাণকর্ত্তা; আমি তোমার দাসীর দাসী হইবার যোগ্যা নহি, আমি তোমার সেবিকা হইবার উচ্চ আশা রাখি না; কিন্তু তুমি দয়া করিলে, আমার ইহকাল ও পরকাল দুই বজায় থাকিবে। ইতি"

"তোমার দাসী

অনুপমা।"

পত্রখানি পাঠ করিলাম, পাঠ করিবার কালে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, হৃদয়কেও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম একি! আমি কি সত্যসত্যই জীবিত? ইহা কি প্রেতপুরীর এক অলৌকিক কাণ্ড? আর প্রিয়নাথ? সে কি দেবতা, না ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষি! ছুটিয়া গিয়া প্রিয়নাথের পদপ্রান্তে পত্রখানি ফেলিয়া দিলাম, সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল। আবার সেই হাসি,—নির্ব্বিকার প্রশান্ত মুখে আবার সেই মুচ্‌কি হাসি! হাসি দেখিয়া আমি ত আর নাই। দুই মাস পূর্ব্বে সেই ভীষণ পত্রখানি পড়িয়া প্রিয়নাথ হাসিয়াছিল, আজ এই প্রাণ-মন পাগল করা পত্রখানি পড়িয়া প্রিয়নাথ আবার হাসিল। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়া আমি বলিলাম, "এমন করিয়া হাস কেন ভাই! বারে বারে এমন করিয়া আমায় দেখিয়া এবং

আমার পত্নীর পত্র পাঠ করিয়া হাস কেন ভাই? তোমার হাসি দেখিলে যে আমি আত্মহারা হই।"

প্রিয়। অত চঞ্চল হইও না, ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া আমি হাসিয়াছি। রোগ কেবল অনুপমার নহে; তুমিও রোগী। অনুপমার চিকিৎসার সঙ্গে তোমরও চিকিৎসা হইতেছে; তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র পথ্যের ব্যবস্থা করি নাই।

আমি। কিছুই বুঝিলাম না। তোমাকেও বুঝিতে পারিলাম না, তোমার ভাষাও বুঝিতে পারিলাম না।

প্রিয়। না বুঝিবারই কথা। যে দিন মা তোমাকে বরণ করিয়া তোমার বিবাহ-যাত্রায় তোমাকে পাঠাইতেছিলেন, সেই সময় মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বাবা, তুমি কাকে আনিতে যাইতেছ?' অবনতমস্তকে তুমি বলিয়াছিলে, 'মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।' বলিতে হয় বলিয়া, তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে; নিজের মনের সহিত লুকোচুরি করিয়া মাতৃসন্নিধানে মিথ্যাকথা কহিয়াছিলে।

আমি। কেন ভাই?

প্রিয়। মায়ের দাসী আনিতে হইলে এত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না। অনুপমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া রূপপূজা করিবার জন্য ছুটিয়াছিলে, তাই তোমার এত বিড়ম্বনা। হিন্দুর সংসার—দেবতার সংসার। সাকার সজীব দেবদেবী—পিতা ও মাতা এই সংসারে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এমন সংসারে বিলাস এবং রূপের সেবা স্থান পায় না। তুমি অঘটন ঘটাইতে চাহিয়াছিলে, তাই তোমায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। আর দিন কয়েক যাউক, অনুপমা যখন

শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবার জন্য অস্থিরা হইবে, তখন তুমি তাহাকে পাইবে।

(৫)

আজ আমার সুপ্রভাত! এমন দিন বুঝি আমার ইহজীবনে আর হইবে না। মাতাঠাকুরাণী দম্‌দমার বাগান-বাড়ীতে আসিয়াছেন। অনুপমা তাঁহার পদসেবা করিতেছে; মা আমায় ডাকিলেন, আমি তাঁহার প্রকোষ্ঠে যাইলাম, দেখি অনুপমা মায়ের এক জানুর উপর বসিয়া আছে, মা আমার হাত ধরিয়া দক্ষিণ জানুতে বসাইলেন, এবং দুইজনের চিবুকে দুই হাত দিয়া বলিলেন, "তোদের ছেলে-মানুষী ঝগ্‌ড়া রাখ্‌। আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই, আমার এ জীবনের সকল সাধ মিটুক।"

হাসিতে হাসিতে আমরা সে দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিলাম। ছয়মাস পরে আমার শয়নকক্ষ আবার অধিকার করিলাম। আহারান্তে পানের ডিবা হাতে করিয়া কক্ষে আসিলাম এবং পর্য্যঙ্কোপরি বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুপমাও আসিল, আসিয়াই সে আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল; শ্রাবণের ধারার ন্যায় তার দুনয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে অধরযুগল ফুলাইয়া ফুলাইয়া, বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে "আমায় ক্ষমা কর" এই কথাটি বলিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না; আমার যৌবন-সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমার সোহাগ-স্বপ্নের হরিণী, এমন করিয়া আমার চরণতলে কেন পড়িয়া থাকিবে!

আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আমার কনক-লতাকে

উঠাইয়া লইলাম। আমার ইহকালের সুখ, আমার বাঙ্গালী-জীবনের সংসার, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পরকালের ভরসা,—সবই বজায় রহিল। এতদিন পরে আমরা দুই জনে হংসদম্পতীর ন্যায় রূপসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

দোপাটি।

(১)

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তৃপ্তি হয় না! এ তো আর নূতন কথা নয়! শ্যাম-সুন্দরের রূপই দেখ—আর মুকুর-প্রতিফলিত নিজের রূপের বিকাশই দেখ;—দেখার মত দেখিতে হইলে, দেখার সাধ কখনই মিটে না।

সাধ মিটে না বলিয়াই তো যত সর্ব্বনাশ হয়! সাধ মিটে না বলিয়াই তো যত সুখের সঞ্চার হয়! সাধ মিটিলেই তো সব শেষ হইল!—সুখেরও শেষ, দুঃখেরও শেষ। কিন্তু সুখ-দুঃখ লইয়া সংসার; সুখ-দুঃখের শেষ হইলে, সংসারেরও শেষ হয়। তাই কভু—

নয়ন না তিরপিত ভেল।

(২)

সুরূপা সুন্দরী। নামেও সুরূপা, গুণেও সুরূপা, দেহেও

সুরূপা। বাহিরের অন্য দশজনের দৃষ্টিতে সে সুরূপা বলিয়া পরিগণিত হইত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তবে স্বামী কান্তিচন্দ্র, সত্যসত্যই সুরূপাকে কেবল সুরূপা দেখিতেন, তাহা নহে; তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতি সুন্দর দেখিতেন।

কান্তিচন্দ্র মালদহে চাকরি করিতেন। সেকালে কালেক্টারীর সেরেস্তাদারকে কালেক্টারীর দাওয়ান বলিত। কান্তিচন্দ্র সেই দাওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অল্প বয়সেই উচ্চপদ পাইয়া কান্তিচন্দ্রের মাথা খারাপ হয় নাই; তবে কান্তিচন্দ্র অবস্থার অতীত দাতা ছিলেন। নিজের বাসা-বাটীতে প্রত্যহ দুই বেলা ৫০।৬০ জন লোকের আহারের জোগাড় হইত। কান্তিচন্দ্র যাহা রোজগার করিতেন, তাহাই ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, তিনি অপুত্রক; বৃদ্ধ মাতা পিতা, বহুকাল পূর্ব্বেই স্বর্গ-গমন করিয়াছেন। কান্তি-চন্দ্রের সংসারে আপনার বলিবার আর কেহ নাই। আছেন কেবল এক বৃদ্ধা মাতৃস্বসা; তিনিই কান্তিচন্দ্রের সংসারের গৃহিণী।

এই সংসারে, কান্তিচন্দ্রের আর একজন আত্মীয় ছিলেন; তিনি মালদহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার প্রসিদ্ধ র‍্যাভেন্‌সা সাহেব। কোমলে ও কঠোরে এমন সংযোগ, মধুরে রৌদ্রের এমন সম্মিলন, আর কোনও 'সিবিলিয়ানে' দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ছিল, তাহা র‍্যাভেন্‌সা সাহেবেই ছিল। তাঁহার প্রভাবে, গৌড়ের গহন বনের বেদিয়া-সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ, সংযত ও শান্ত হইয়া ছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া এই সকল দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর, স্বেচ্ছায় ইংরাজের অধীনতা স্বীকার

করিয়াছিল। এই র্যাভেন্‌সা সাহেব, কান্তিচন্দ্রকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার ভালবাসার গুণেই, কান্তিচন্দ্র মালদহ-জেলার দাওয়ান।

(৩)

মাঘী পূর্ণিমা,—পুণ্যাহ। হিন্দুমাত্রেই গঙ্গাস্নান করিবার জন্য উদ্‌যোগী। পশ্চিমে বাতাস ফুর্‌ফুর করিয়া একটু বহিতেছে। বাতাসের উপর শীত, ছোট ছেলেটির মত ঘোড়-সওয়ার হইয়া, সূর্য্যরশ্মির প্রখরতাকে নষ্ট করিতেছে; আর দরিদ্রের ছিন্নকন্থা উল্‌টাইয়া ফেলিয়া, শীর্ণ ও শুষ্কদেহে যেন সূচী বিদ্ধ করিতেছে। দরিদ্র শীতের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে; আর ধনী নানাবস্ত্রাবৃত হইয়া, শীত-প্রফুল্লিত রাগরক্তিম মুখে, যেন দরিদ্রের এই কম্পনকে বিদ্রূপ করিতেছে।

কারাগোলার মেলা। এইখানে কুশী নদী গঙ্গায় আসিয়া নিজ অঙ্গ মিলাইয়াছেন। বৎসরে বৎসরে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই সঙ্গমস্থলে মহামেলা হয়। মালদহ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, রাজমহল প্রভৃতি নানা জেলার, নানা স্থানের লোক এই দিনে আসিয়া এইখানে গঙ্গাস্নান করিয়া কৃতার্থ হন।

স্বরূপা স্বামীসহ গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। দাওয়ানজীর এক তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবু সঙ্গমের মুখে চরভূমির উপর স্থাপিত। তাঁবুমধ্যে বৃদ্ধা মাসী, একখানি গড়া-কাপড় পরিয়া শীতে কাঁপিতেছেন;—আর দণ্ডে দণ্ডে গিয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিতে-ছেন; কান্তিচন্দ্র মাসী-মাকে বারে বারে হাত ধরিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার স্নানান্তে আবার তাঁহাকে তাঁবুতে আনিয়া বসাইতেছেন।

সুরূপার বয়স আঠার বৎসর। ব্রাহ্মণের কন্যা, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া, তায় আবার দাওয়ানজীর পত্নী। সুরূপার অবরোধে থাকিবারই কথা। কিন্তু আজ পুণ্যদিন; স্থান—পবিত্র তীর্থক্ষেত্র; কাজেই সুরূপার অন্য আর তেমন অবরোধ নাই। তিনি একটি দাসী সঙ্গে করিয়া স্বেচ্ছায় গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এবং আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়াই অন্নদান ও অর্থদান করিতেছেন।

(৪)

দাওয়ানজীর তাঁবুর সম্মুখে বড় ভিড়। দীন-দুঃখী-কাঙালীর ভারি ভিড় লাগিয়াছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া, একটি বালিকা আসিয়া কান্তিচন্দ্রের হাত ধরিল। বালিকার পরিধানে কিছুই নাই বলিলেও চলে। এক টুক্‌রা ছেঁড়া কম্বল, কষ্টে কোমরে জড়াইয়া লজ্জা-নিবারণ করিয়াছে। বালিকার বয়স ষোল বৎসর। বালিকা কান্তিচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিল—"বাবুজী! বড় শীত, বড় ক্ষুধা; আমায় কিছু দাও।"

"তুমি কি নেবে? চা'ল, ডা'ল, কাপড় সবই আছে, তোমার যা ইচ্ছে, তাই নেও।" উদাসভাবে বালিকার প্রতি তাকাইয়া কান্তিচন্দ্র এই কয়টি কথা বলিলেন।

"চা'ল-ডা'ল নিয়ে কি ক'র্‌বো? কাপড়-চোপড় নিয়ে কি ক'র্‌বো? আমায় ভাত রেঁধে দেবে কে? কাপড় প'র্‌লেই ওরা যে আমার কাপড় কেড়ে নেবে!"

"তুমি কে? তোমার সঙ্গে আর কেউ নাই? তোমার বাপ-মা নেই? তুমি যদি ভাত খেতে চাও, তবে ঐ তাঁবুতে গিয়া ব'সো"—একটু যেন সাগ্রহে এই কয়টি কথা বলিয়া, কান্তিচন্দ্র বালিকাকে

তাঁবু দেখাইয়া দিলেন। একটি দাসী বালিকার হাত ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেল।

সুরূপা, বালিকাকে পাইয়াই তাহাকে একখানি বস্ত্র পরিতে দিলেন। বালিকা কাপড় হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরূপা তাহা দেখিয়া বলিলেন,—"লজ্জা কি? কাপড় পর।"

"আমি যে কাপড় পরিতে জানি না;—আমি কখনও কাপড় পরি নাই।"

সুরূপা। তবে তুমি কাপড় চাহিতেছিলে কেন?

বালিকা। যাদের কাছে আমি থাকি, তাদের জন্যই আমি কাপড় ভিক্ষে ক'রে নিয়ে যাই। এই শীতে আমায় একখানা ছেঁড়া কাপড় দিয়েছিল; সেখানাও আজ কেড়ে নিয়েছে। আমি সে কাপড়খানি গায়ে দিতাম। আজ এই মেলায় নতুন কাপড় ভিক্ষে ক'রে নিয়ে গেলে তবে সেই কাপড়খানি পাবো।

সুরূপা। তোমার তারা কোথায়?

বালিকা। এই ভিড়ে তাদের হারিয়েছি। তারা আমায় খুঁজে নেবে।

সুরূপা। তারা তোমার কে? তোমার বাপ-মা নেই?

বালিকা। তারা বেদে; ভিক্ষে করে, মেয়ে-ছেলের হাত দেখে, ওষুধপত্র দেয়, আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। আমার খিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাও; আর এই কাপড়খানি পরিয়ে দাও।

সুরূপা, সরলা বালিকার কথা শুনিয়া, মুখ ঘুরাইয়া চক্ষের জল মুছিলেন। তাঁবুতে গরম জল ছিল; সেই গরম জলে বালিকার দেহ সুন্দররূপে মার্জ্জিত করিয়া, দিব্য একখানি চুমুরী

কাপড় তাহাকে পরাইয়া দিলেন; বালিকা কাপড় পরিয়া তাঁবুর এক কোণে বসিয়া রুটি খাইতে লাগিল। আর সুরূপা একদৃষ্টে সেই বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন।

বালিকা অপূর্ব্ব-সুন্দরী। মাথায় জটাভার আছে বটে; ফণি-বিনিন্দিত কুঞ্চিত কেশরাশি নাই; কিন্তু জটাভারেই গ্রীবার ও মস্তকের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রং মাজা,—শ্যামবর্ণ। কার্ত্তিকের গঙ্গার জলের ন্যায়, কাক-চক্ষুর ন্যায় দেহের আভা। গঠন অতি সুন্দর; ঠিক যেন পাথরে কোঁদা।

সুরূপা দেখিতে লাগিলেন; আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"বেদের মেয়ে এমন সুন্দরী হয়! এ নিশ্চয় ভদ্রঘরের মেয়ে; বেদেরা চুরি করিয়া আনিয়াছে।"

এমন সময় বাহিরে একটা গোল হইল। এক প্রৌঢ়া রুক্ষ-কেশা গলিত-দেহা রমণী তাঁবুব ভিতর আসিয়াই কিচিমিচি কি বকিয়া উঠিল। সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ সুরূপাকে দেখিয়া, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার সেই বালিকার দিকে তাকায়, আবার সুরূপার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি করে।

"রেখো না মা, ওকে রেখো না, ও তোমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে।"

"করে ক'র্‌বে। তোকে এখানে ডাক্‌লে কে?"

"যদি রাখ—তো আমার বেটীর দাম দাও।—দশ টাকা দাম।"

সুরূপা বিরক্তির ভাবে দশটা টাকা মাগীর দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাগী ধীরে ধীরে সেই দশটি টাকা, এক একটি করিয়া গণিয়া তুলিয়া লইল। মাগী যাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া সুরূপাকে বলিয়া গেল,—"যখন কেবল কাঁদ্‌বে মা, তখন গৌড়ের জঙ্গলে 'সা'-সাহেবের মস্‌জিদে যেও; আমার সঙ্গে দেখা হবে।"

(৫)

বলিকার নাম দোপাটি। বালিকা কিছুই জানে না। যাহা জানিলে, মানুষ—মানুষ হয়, সুখ-দুঃখ বুঝিতে পারে, পাপ-পুণ্যের বিচার করিতে পারে, বালিকা তাহার কিছুই জানে না। বালিকার ভয় নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই। অথচ বালিকার বয়স ষোল বৎসর হইয়াছে।

বালিকার মাথায় আর জটা নাই। জটার স্থানে এখন কুঞ্চিত কেশরাশি এলাইয়া আছে। বর্ণের সে পাংশুল ভাব নাই—দিব্য গৌরকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুরূপাকে সে দিদি বলিয়া ডাকে; কান্তিচন্দ্রকে কখনও দাদা বলে, কখনও বাবু বলে; সর্ব্বদাই ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া বেড়ায়।

কাজের মধ্যে বালিকা পান সাজিতে শিখিয়াছে; সে যতগুলি পান সাজে, সকলগুলিই কান্তিচন্দ্রকে খাওয়ায় বা সুরূপার মুখে গুঁজিয়া দেয়। বালিকার আচার-বিচার-জ্ঞান নাই, উচিত-অনুচিত-বোধ নাই। কান্তিচন্দ্র পান খাইতে না চাহিলে, সে তাঁহার গলা ধরিয়া মুখে পান গুঁজিয়া দিত। তখন কান্তিচন্দ্র কেবল শিহরিতেন। কি জানি, দোপাটির গায়ে কি লাগান ছিল! কি জানি, দোপাটির ভাবভঙ্গিতে কেমন মাধুর্য্য ছড়ান ছিল!

(৬)

সুরূপা দোপাটিকে বড় ভাল বাসিতেন, চাকর-বাকর বা অন্য কেহ দোপাটির অতিচাঞ্চল্য দেখিয়া যদি তিরস্কার করিতে যাইত, তাহা হইলে সুরূপা সকলকেই ভর্ৎসনা করিতেন। এমন কি,

স্বামী কান্তিচন্দ্র যদি কদাচিৎ দোপাটিকে শাসন করিতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে সুরূপা স্বামীকেও তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না।

এত ভালবাসা, এত টান, এত আদর, এত সোহাগ সত্ত্বেও যখন দোপাটি কান্তিচন্দ্রের গলা জড়াইয়া তাঁহার মুখে পান গুঁজিয়া দিত, তখন কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া সুরূপার কেমন কেমন ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার সময় দোপাটি কান্তিচন্দ্রের মুখে একটা বড় পান দিয়া সেই পানের অর্দ্ধেকটা নিজের দাঁত দিয়া কাটিয়া লইল; এইবার সুরূপার কেমন-কেমন-ভাব রোষে পরিণত হইল। সুরূপা স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে কক্ষাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং একটু যেন কেমন ভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ! হাজার হউক, দোপাটি মেয়েমানুষ—সুন্দরী—ষোড়শী—পূর্ণযুবতী; ও কিছু না জানিলেও বয়সের গুণে ধীরে ধীরে আপনা-আপনি অনেক কথা বুঝিতে পারিবে। তুমি ওকে অমনভাবে ঘাড়ে-পিঠে কর, মুখে মুখ দিয়ে পান খাও, পান দাও;—এ সব কিন্তু আমার ভাল লাগে না, তোমার মনে পাপ না থাক্‌লেও লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এ সব কাজ মন্দ, তুমি আর ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার ক'রো না।" কান্তিচন্দ্র একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "রূপ! ভয় কি, আমি ত অষ্টপ্রহরই তোমার কাছে থাকি—আর যা কিছু করি, তোমার সম্মুখেই করি, তবে আর ওতে পাপ কি?"

সুরূপা। আমার সম্মুখে কর ব'লেই পাপ-কাজ পুণ্যময় হবে, এমন কিছু লেখা আছে কি? তুমি আর অমন ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌বে না, অন্ততঃ আমার সম্মুখে ও সব কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না।

কান্তিচন্দ্র স্ত্রীর আদেশবাণী শুনিয়া স্বরূপার দিকে তাকাইয়া মুসলমানী ধরণে একটা লম্বা সেলাম করিলেন এবং বলিলেন, "জো-হুকুম বেগম সাহেবা, গোলাম হুজুরের হুকুম তামিল ক'র্‌বে।"

(৭)

শিশুকে যাহা করিতে বারণ করা যায়, শিশু তাহা অগ্রে করে। নবাগত শিশু সংসারের তাবৎ বিষয়ই নূতন দেখে—সকল সামগ্রী দেখিয়া তাহার মনে হয়, এমন বুঝি আর দেখি নাই—একবার দেখি, দুইবার দেখি, বারবার দেখি। ইহার উপর যদি তাহাকে কোন কার্য্য করিতে বারণ করা যায়, তাহা হইলে শিশুর অনুসন্ধিৎসা দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া যায়; সে সহস্র বিঘ্ন সত্ত্বেও গোপনে সেই কাজ করে। গুপ্তভাবই পাপের মূল।

কান্তিচন্দ্র বিজ্ঞ কর্ম্মচারী হইলেও ভাবজগতে তিনি শিশু। স্বরূপা যখন দোপাটির সহিত অত হুড়াহুড়ি করিতে বারণ করিলেন, তখন কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের ভস্মাচ্ছাদিত বিলাসবহ্নি একবার যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লজ্জা ও ভয়ে সে জ্বালা যেন বস্ত্রাঞ্চলে চাপা রহিল, কান্তিচন্দ্র সাম্‌লাইলেন—কিন্তু মনের সাধ তুষের আগুনের মত মনের মধ্যে ধিক্‌ধিক্ জ্বলিতে লাগিল। কান্তিচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, অতঃপর দোপাটিকে লইয়া স্বরূপার চক্ষের অন্তরালে হুড়াহুড়ি খেলা করিবেন; তাহার সহিত খেলা করিলে তিনি সুখ বোধ করেন। পাপভুজঙ্গ এমনি ভাবেই মনুষ্যহৃদয়রূপী চন্দনতরুকে জড়াইয়া ধরে।

(৮)

"ও দোপাটি! ও শীতলপাটি! তুই আমার কাছে আয় না,

আমার মুখে পান দে না”—দোপাটি কিন্তু এখন আর তেমন হাসে না, তেমন ছুড়াহুড়ি করে না,—দোপাটি যেন এখন কেমন হইয়া গিয়াছে! সুরূপাকে সম্মুখে রাখিয়া দোপাটি যেমন দুষ্টামি করিত, বাহিরের ঘরে বা বাগানবাটীতে কান্তিচন্দ্রকে একলা পাইলেও দোপাটি তেমন হাসে না, তেমন বকে না। ঐ শুন না, বিহ্বল কান্তিচন্দ্র দোপাটিকে বারবার ডাকিতেছেন। দোপাটি কাছে আসিতেছে না, একটু যেন সলজ্জভাবে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

না পাইলেই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, মনের মতনটি না হইলেই মনের মতন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে ইচ্ছা করে। কান্তিচন্দ্র দোপাটির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, গৃহ ছাড়িয়া বাগানবাটীতে বাস করিতেছিলেন; দিনান্তে সুরূপার শুষ্কমুখ দেখিবার জন্য একবার বাসায় যাইতেন বটে, কিন্তু সে যাওয়া মাত্র, সে লোক-দেখান যাওয়া, তথাপি দোপাটি কিন্তু তাঁহার হইল না; ফুলের প্রজাপতির মত দোপাটি এক এক বার তাঁহার কাছে আসে, আবার রূপের পাখা ছড়াইয়া দূরে পলাইয়া যায়। আশায় উৎকণ্ঠায়—নৈরাশ্যে বিষাদে কান্তিচন্দ্রের অপরূপ রূপ শুকাইয়া গেল, চক্ষু কোটরগত হইল, তিনি একপ্রকার আত্মহারা হইলেন।

(৯)

ওদিকে সুরূপাও কৃষ্ণপক্ষের শশীর ন্যায় দিনে দিনে মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন; স্বামীর মঙ্গলচিন্তা, সংসারের চিন্তা, নিজের চিন্তা, ইহকাল-পরকালের চিন্তা, কত চিন্তা আসিয়া

তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল; জীয়ন্ত অবস্থায় চিন্তারূপ চিতায় অহরহঃ পুড়িতে লাগিলেন।

দুঃখে পড়িয়া সুরূপার মেজাজটাও খারাপ হইয়া গেল; স্বামী আসিলে স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না; এমন কি, তাঁহার কাছে পর্য্যন্ত যান না। একদিন সন্ধ্যার সময় কান্তিচন্দ্র বিষাদমুখে বাসায় আসিয়াছেন, মনের সাধ—সুরূপার সহিত দণ্ড কয়েক কথা কহেন; সুরূপা কথা কহিল না, সরিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। কান্তিচন্দ্র সুরূপার হাত ধরিলেন,—বলিলেন, 'রূপ! একটু দাঁড়াও, আমার দুটা কথা শুন। তুমি কেন অমন কর, আমি ত কোন দোষের দুষী নহি। আমি ত কোন পাপই করিনি। তোমায় যথেষ্ট অর্থ দিচ্চি। তুমি যা চাচ্চ, তাই পাচ্চ, তবে তুমি এমন কেন?"

সুরূপা। কথা কহিব না ভেবেছিলেম, কিন্তু তুমি যখন হাত ধ'রে কথা কহিলে, তখন একটা উত্তর দিতেই হয়। আমি তোমার টাকা পয়সা চাইনে, ধনদৌলত চাইনে, আমি তোমাকে চাই। তুমি যখন আমার হ'লে না, তুমি যখন আমার চক্ষের উপর একটা বেদের মেয়েকে নিয়ে বাগানে আমোদ-প্রমোদ ক'রতে লজ্জা বোধ ক'চ্ছো না, তখন তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।

ছি ছি সুরূপা, হেলায় হাতের পাঁচ হারাইলে! এখনও যে অনেক খেলা বাকি আছে! স্বামীর সহিত সম্বন্ধ নাই কি? তোমার ভাগ্য যে পতির ভাগ্যের সহিত পদ্মনালের সূত্রের ন্যায় সংবদ্ধ! তোমার অদৃষ্ট—তাই এমন স্বামী অন্যানুরক্ত, প্রায়শ্চিত্ত কর, অদৃষ্টের দোষ-খণ্ডন হইবে।

(১০)

পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কান্তিচন্দ্র উদাসনয়নে বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন। তিনমাস দোপাটির সাধনা করিয়াও তাহাকে নিজের করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বরূপার আশ্রয়ের আশায় গিয়াছিলেন; স্ত্রী হইয়া স্বরূপা তাঁহাকে দূর করিয়া দিল, জ্বালা জুড়াইবার জন্য,—বুকের বোঝা নামাইবার জন্য কান্তিচন্দ্র আর কোথায় যাইবেন? ধীরে ধীরে কান্তিচন্দ্র আবার সেই বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে, আকাশের পূর্ব্বকোণে চাঁদ উঠিয়াছে; গ্রীষ্মকাল, ঝির্‌ঝির্ করিয়া একটু হাওয়া বহিতেছে, বাগানে বেলা-চামেলি, জুঁইফুল ফুটিয়াছে, সৌরভে দশ-দিক্ আমোদিত করিয়াছে। দোপাটি ফুলের হার, ফুলের বলয়, ফুলের মুকুট পরিয়া, বনবালা সাজিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একরাশি চুলের উপর থরে থরে চম্পকের মালা সাজান আছে; দোপাটির অপরূপ রূপ! ভগ্নহৃদয় কান্তিচন্দ্র উদাস মনে বাগানে প্রবেশ করিলেন। উপরে চাঁদের আলো, নীচে ফুলের আলো, আর এই দুই আলোর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া দোপাটি নিজের রূপের আলোর সহিত ফুলের আলো মিশাইয়া চাঁদের আলোয় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে; কান্তিচন্দ্রের বিষাদ গেল, নৈরাশ্য দূর হইল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, দেখি কোন্‌টা! উপরে আকাশ, আকাশের চাঁদ দেখিব,—না নীচে বাগান, বাগানের ফুল দেখিব,—না নানাপুষ্পাভরণভূষিতা ফুল্লার-বিন্দবদনা কিশোরী বনদেবীকে দেখিব? কান্তিচন্দ্র বিহ্বল—

বিমূঢ় হইলেন, বিভ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দোপাটির কাছে গিয়া পড়িলেন। দোপাটির আর সে ভাব নাই, এখন সে সলজ্জা গম্ভীরা নারী; কান্তিচন্দ্র এই নারীমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে তাহার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "দোপাটি! এমন করিয়া কতদিন কাটিবে, আমি যে আর পারি না; দেহ মন উভয়ই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে; আমি নয়ন মেলিয়া দশ দিক্ অন্ধকার দেখি, আর নয়ন মুদ্রিত করিলেই কেবল তোমাকেই দেখিতে পাই। আমার অসহ্য হইয়াছে,—আমি বুঝি অধিকদিন বাঁচিব না। তোমার আমি যা উপকার করিয়াছি, তোমাকে আমি যে ভাবে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার শোভা পায়? তুমি যে আমায় তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছ, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না; তোমার ধর্ম্মে যাহা হয় তুমি তাহাই কর।"

দোপাটি। বস্ বাবু,—বস্, আর বলিতে হইবে না। আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্মও নাই, পুণ্য নাই, পাপও নাই, কেবল আমরা উপকারকের উপকার ভুলি না, সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারি; তুমি নিজকৃত উপকারের ঋণের কথা আমাকে বলিয়াছ। আমি ভাবিতাম, তুমি ও কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবে না। যখন আজ আমাকে বলিলে, তখন তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করিবই। আমার সর্ব্বস্ব দিয়া তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। কিন্তু আমাকে পাইলে তোমার অত্যন্ত অমঙ্গল হইবে। এ কথা আমাদের কর্ত্তা-মা সেই কারাগোলার ঘাটে তোমার পত্নীকে

প্রথম দিনই বলিয়া গিয়াছেন। সে কথা আমি খুব বিশ্বাস করি, তাই এতদিন ইচ্ছা করিয়াই তোমার সাধ মিটাই নাই। যখন উপকারের কথা তুলিয়াছ, তখন তোমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক। আমার কর্ত্তব্য আমি করিব। আমার সর্ব্বস্ব—তোমার আকাঙ্ক্ষণীয় আমার রূপযৌবন তোমাকে দিব। আমি ঋণের দায় হইতে মুক্ত হইব। কিন্তু জানিও, বেদের মেয়ে চিরকাল কাহারও হইয়া থাকে না; আর জানিও, বেদের মেয়ে তোমাদের মত ভাল বাসিতেও জানে না।

কান্তিচন্দ্র। আমার আবার বিপৎ--সম্পদ্ কি; বাঁচিলে তবে ত?

দোপাটি। তোমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে; আমি কি করিব বল। কিন্তু এইটুকু মনে রাখিও, তোমার ভাগ্যই তোমাকে সর্ব্বনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি সে পক্ষে কোন চেষ্টাই করি নাই। আমার বয়স হইয়াছে, কেহ কিছু না শিখাইলেও আমি এখন সব বুঝিতে পারি; তোমার মুখ দেখিয়া আমি সব জানিতে পারিয়াছি। তবে সতী নারীর দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ যায় না, বেদের মেয়ে হইলেও এ কথা আমরা অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকি।

এই কয়টি কথা বলিয়া বালিকা দোপাটি অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কান্তিচন্দ্র আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, পঙ্গু হইয়াও গিরিলঙ্ঘনের সামর্থ্য পাইলেন। অতীত, আগত এবং অনাগত, এই তিন অবস্থাই তাঁহার পক্ষে সমান হইল। তিনি জগৎ ভুলিলেন।

(১১)

কান্তিচন্দ্র এখন কি সুখী? তাহার ত মনের সাধ মিটিয়াছে। সে ত অলভ্যকে লাভ করিয়াছে। জ্ঞানহারা দিশাহারা হইলে যদি সুখী হওয়া যায়, তবে কান্তিচন্দ্র সুখী বটে; কিন্তু সে যে এখন পাগল, পাগলকে সুখী করিব কেমন করিয়া! কান্তিচন্দ্র দোপাটির রূপে পাগল, পাগলকে সুখী করিব কোন্ সাহসে! কান্তিচন্দ্র দোপাটির রূপেও পাগল, দোপাটির গুণেও পাগল, দোপাটির ভয়েও পাগল,—সে এখন ত্রিভুবন দোপাটিময় দেখে। উপাসক ইষ্টদেবীর যেরূপ সেবা করেন, কান্তিচন্দ্র দোপাটির ততোধিক সেবা করে। কাছারীর কাজ নাই, বাটীতে যাতায়াত নাই, লোক-লৌকিকতা নাই, তেমন স্বজন প্রতিপালনও নাই,—কান্তিচন্দ্রের আছে কেবল দোপাটি।

দোপাটিকে পাইয়া কান্তিচন্দ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল বটে, দোপাটি কিন্তু কেমন-কেমন হইয়া রহিল। এত ভালবাসার প্রতিদান ছিল না, মধুর প্রেম-সম্ভাষণের প্রতি-উত্তর দোপাটি কখনই করিত না। বাগানের ঝোপে ঝোপে বৃক্ষরাজির শ্যাম ছায়ায় ছায়ায় দোপাটি কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। কান্তিচন্দ্র দোপাটিকে ক্ষণে ক্ষণে হারাইতেন, তাহাকে না দেখিতে পাইলেই পলকে প্রলয় দেখিতেন। দূরে লতাবিতানের হরিৎ বর্ণাভার মধ্যে দোপাটির কনকলতা-সদৃশী লাবণ্যপ্রফুল্লা দেহ-বল্লরী দেখিতে পাইলে, শ্যাম বৃক্ষপত্রের মধ্যে পবনবিক্ষিপ্ত দ্বিরেফমালার ন্যায় তাহার কেশদামের প্রকম্পন দেখিতে পাইলে, কান্তিচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইতেন; তাহার

হাত ধরিয়া কত আদর করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতেন। দোপাটি আসিত,—কিন্তু অনিচ্ছায়, কখনই অনুরাগের রক্তিমা-মাখা দোপাটির গণ্ডযুগল কান্তিচন্দ্রের নয়নমোহন করে নাই। দোপাটি মৃতব্যক্তির ন্যায় অসাড়, নিস্পন্দ, ভাবশূন্য দেহলতা কান্তিচন্দ্রের নিকট ফেলিয়া রাখিত। আর দোপাটির মন, কি জানি কোন এক অজ্ঞেয় দূরদেশের জন্য কাতর হইত। এক একবার উদাসনয়নে গগনোপান্তের ক্ষীণ শ্যামল রেখা দেখিয়া দোপাটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত। ঐ খানেই গৌড়ের জঙ্গল।

ধীরে ধীরে কান্তিচন্দ্র সব বুঝিলেন, পরন্তু বুঝিয়াও তিনি বুঝিতে চাহিলেন না। দোপাটি তাঁহাকে ভাল বাসে না, দোপাটি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলে বাঁচে,—এ কথা কান্তিচন্দ্র বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। উঃ—দোপাটি যে তাঁহার জীবন;—দোপাটির জন্য তিনি যে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন; দোপাটি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে? না—না, এমন কি হয়! এইরূপ নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিয়াও কান্তিচন্দ্র নিজের মনকে স্থির করিতে পারিতেন না। মনটা যেন কেমন আলো-আঁধারে পড়িয়া গোধূলি-আচ্ছন্ন প্রদোষকালের ন্যায় অপরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছিল। কান্তিচন্দ্র কেবল ভাবিতেন, ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেন না। সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। কিছুই পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেন না। রূপ-বিলাসের প্রমোদ-মোহ এখনও কাটিয়াও কাটে নাই, প্রার্থিতের প্রাপ্তিজনিত চিত্তের স্থৈর্য্য এখনও হয় নাই। কান্তিচন্দ্র এখনও পিপাসিত,—এখনও লালসাবহ্নির লোলজিহ্বা তাঁহার চিত্ত ও বুদ্ধিকে মাঝে মাঝে ঝলসাইয়া দিতেছিল। এখনও দোপাটিকে

দেখিলে কান্তিচন্দ্র ত্রিভুবন ভুলিয়া যাইতেন। হায় সংসার-সুখ! কান্তিচন্দ্র এমন দোপাটিকে পাইয়াও সুখী হইতে পারিলেন না।

(১২)

শ্রাবণ মাস, আকাশ সর্ব্বদাই মেঘে ঢাকা, ধরাতল সর্ব্বদাই জলে ভরা, অনবরত বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে; দেখিলে মনে হয়, আকাশের দেবতাগণ যেন পৃথিবীর জন্য কেবল রোদন করিতেছে, —এ রোদনে তর্জ্জন-গর্জ্জন নাই, বিদ্যুতের ভীষণ বিকাশ নাই, সব স্তম্ভিত; কেবল ঝর্‌ঝর্‌ আসারসম্পাত; ঘোর অন্ধকার, আকাশেও আলো নাই; ধরাতলেও আলো নাই; কোলের মানুষ চেনা যায় না, কিন্তু দেখা যায়; কেবল অন্ধকারের স্তূপের মধ্যে মাঝে মাঝে খদ্যোতের অগ্নিবিন্দু দেখা যাইতেছে। খদ্যোতেরা অমানিশার ঘোর অন্ধকারের কোলে বসিয়া কচি-মেয়ের মত মিট্‌ মিট্‌ করিয়া চাহিতে থাকে, আর তমিস্রার গভীরতা বুঝাইয়া দেয়, অনন্ত আকাশের কালো বরণের প্রগাঢ়তা দেখাইয়া দেয়। বর্ষার অন্ধকার রাত্রে তাহারা পিট্‌ পিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে—অশ্বত্থের মাথায়, কদলীর গাত্রে, সহকার-শাখায়, লতাকুঞ্জের মধ্যে পিট্‌ পিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, আর সজল গাঢ় অন্ধকারের গভীরতা যেন দেখাইয়া দিতেছে। মনে হইতেছে, যেন কর প্রসারিত করিলে, তরল অথচ গাঢ় অন্ধকার মুষ্টি মুষ্টি করিয়া ধরা যাইবে। কান্তিচন্দ্র বাগানবাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, বাহিরের অন্ধকারের সহিত নিজের অন্ধকারময় মনকে মিশাইয়া দিয়া তমঃপিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছেন।

বাহিরের খদ্যোত-দীপ্তির ন্যায় তাঁহার অন্ধকারময় মনের মধ্যে এক একবার বিবেক-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই মনোময় অন্ধকারের মধ্যে এই দীপ্তির সাহায্যে এক একবার প্রেতপুরীর ছায়ার ন্যায় সুরূপার মলিন মুখখানি অন্ধকার-পিণ্ডের মত প্রতি-ভাত হইতেছে,—স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু মনে হইতেছে, সেই অন্ধকারাবগুণ্ঠিত মুখখানি আর কাহারও নহে—সুরূপার! কান্তিচন্দ্র দেখিতেছেন,—মনমাঝে ও বনমাঝে অন্ধকার দেখিতেছেন, ছায়াকার রূপও দেখিতেছেন, দেখিয়া তিনি বিহ্বল-বিমূঢ় হইতেছেন। পরক্ষণেই আবার মহামোহ ঘনান্ধকারের ধারা ঢালিয়া কান্তিচন্দ্রের মনটুকুকে আপ্লাবিত করিতেছে। এমন সময়ে অন্ধকার ঠেলিয়া যেন দোপাটি দাঁড়াইল। দোপাটির অপূর্ব্ব বেশ, পরণে ভিজা কাপড়, বস্ত্রাঞ্চল হইতে টশ্ টশ্ জল পড়িতেছে, আজানুপরিলম্বিত কেশরাশি বাহিয়াও জল পড়িতেছে, আর সেই কেশরাশির উপর খদ্যোতের মালা জড়ান আছে; দপ্ দপ্ করিয়া খদ্যোতের মালা জ্বলি-তেছে, আর মনে হইতেছে, যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া কত মণিমাণিক্যের দ্যুতি ঝরিয়া পড়িতেছে। দোপাটি বেদের মেয়ে, ফুল ফল লতা লইয়া কেশ বিন্যাস করিতে তাহার ন্যায় কেহ জানিত না। সে যেমন জোনাকি ধরিয়া জোনাকির মালা গাঁথিত, তেমন বুঝি অন্য কেহ জানিত না। তাই তাহার সাজের গুণে তাহাকে মর্ত্ত্যের নয় বলিয়া মনে হইতেছিল।

দোপাটি। বাবুসাহেব! আমি আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, আমার কাল ফুরাইয়াছে, আমি আর আপনার নিকট থাকিতে পারিব না। আমার ঋণ আমি পরিশোধ করিয়াছি।

কান্তিচন্দ্র। সে কি দোপাটি! তুমি যাবে কেন? তুমি গেলে যে আমি ম'রে যাব, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব! অমন কথা ব'লে ঠাট্টা কোরো না, দোপাটি!

দোপাটি। আমি ত ঠাট্টা-তামাসা জানিনে। আপনি ত আমায় ভালবাসার জোরে পান নাই, আমাকে ভাল বাসিতেও শেখান নাই; আপনি আমার উপকারক, সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করিয়াছিলাম। আমি এখন গর্ভবতী, আপনার আমার উপর আর কোন অধিকার নাই; আপনার গৃহে, আপনার আশ্রয়ে, আমি সন্তান প্রসব করিব না। আমাদের বেদীয়া-নিয়ম এই, আপনার আশ্রয়ে আপনারই ঔরসজাত সন্তান প্রসূত হইলে চিরজীবন সে আপনার দাসত্ব করিতে থাকিবে—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। গৌড়ের জঙ্গলের কোন এক গুপ্তস্থানে আমাদের একটি আড্ডা আছে, আমি সেইখানেই থাকিব।

কান্তিচন্দ্র। না—না দোপাটি অমন কথা মুখে আনিও না। আর একবার অমন রূঢ় কথা শুনাইলে আকাশভরা মেঘ আমার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দোপাটি। বাবু শুন। আমিও বাঙ্গালী বড় মানুষের মেয়ে। আমার মা বেদীয়া রমণী। এক বাবু মালদহের জঙ্গলে শিকার করিতে আসিয়া আমার মায়ের সর্ব্বনাশ করিয়া যান। মা বাঙ্গালীর বাঁদী হইয়া আছেন। আমাকে বেদেরা চুরী করিয়া আনিয়াছে। আমারও নসীবে বাঙ্গালীর সেবা লেখা আছে। নসীব ফলিয়াছে, আমার গ্রহের শান্তি হইয়াছে, আমার

গর্ভ হইয়াছে, আর আমি থাকিব না, আমি বাঁদী হইতে পারিব না, আমার বাচ্ছাকে বাঁদীর বাচ্ছা করিতে পারিব না। বাবু সেলাম।

কান্তিচন্দ্র। সে কি দোপাটি! তা হবে না, আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধী, আমার সে সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমার কাছে থাকো, আমি তোমায় ঈশ্বরী করিয়া রাখিব। আমিই তোমার গোলাম হইয়া আছি। তুমি আমার গোলাম হইবে কেন? আমার মাথা খাও, তুমি যাইও না। বাহিরেও যেমন অন্ধকার, ভিতরেও আমার তেমনি অন্ধকার, কেবল তুমিই সে আঁধারে চাঁদের আলো—তুমি যাইও না! তুমি চক্ষের আড়াল হইলে যে মরিব!

অনতিদূরে অন্ধকার ভেদ করিয়া উত্তর আসিল, "তুমি মরিবে না, পাগল হইবে, তুমি মরিবে না, পাগল হইবে; আমি চলিলাম।" উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত কান্তিচন্দ্র "কোথায় যাও" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সেই কণ্ঠশব্দের দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারকে গাঢ় করিয়া বারবার মুষলধারে শ্রাবণের মেঘের অশ্রান্ত বর্ষণ হইতে লাগিল, অগণিত ভেককুল অজস্র বর্ষাবারিপানে উল্লসিত হইয়া চারিদিক্ হইতে যেন বিকট হাস্যের শব্দ করিতে লাগিল, আর সেই শব্দরাশির সহিত কান্তিচন্দ্রের আর্ত্তস্বর অতীতের অনন্তে মিশাইয়া গেল।

(১৩)

প্রভাত হইয়াছে, বর্ষাকালের প্রভাত। এ প্রভাতের কোন

শোভাই নাই, কেবল নিশাকালের ঘনান্ধকার অপসৃত হইয়াছে মাত্র,—আর সেই বৃষ্টি, সেই মেঘ, সব সমানই বর্ত্তমান। সূর্য্যের প্রভা আছে বটে, কিন্তু কিরণ নাই, পাতায় পাতায় সোণার বরণ নাই। আছে কেবল কার্ত্তিকের গঙ্গাবারির ন্যায় পাটল সূর্য্য-প্রভা। পক্ষীর কলরব নাই, জীবজন্তুর চীৎকার নাই, মনুষ্যের কোলাহল নাই;—আছে কেবল পেচকগণের পক্ষবিধূননশব্দ, বর্ষাবারিপ্রবাহের উপর গৃহপালিত পশু ও কৃষকগণের পদ-প্রক্ষেপ জন্য ঝপ্ ঝপ্ থপ্ থপ্ শব্দ। প্রভাত হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রাবণের ধারাভারে সকলই যেন অবনত ও স্তব্ধ।

ওকি ও! ওই ভাঙাবাড়ীটার সম্মুখে ভাঙ্গাদরজার পাশে ওটা কি ও! ওকি মনুষ্যের শবদেহ, না জলস্রোতঃ-সমাহৃত লতাগুল্মকর্দ্দমাচ্ছাদিত মনুষ্যদেহ! একটু অগ্রসর হইয়া দেখ দেখি, ওটা কি! এ যে কান্তিবাবুর বাড়ী, সে বাড়ীর এই শ্রী হইয়াছে! যে বাড়ীতে বারমাস পূজাপার্ব্বণে ব্রাহ্মণভোজন হইত, সে বাড়ী এখন জনশূন্য!

ধীরে ধীরে একটি বৃদ্ধা বাহিরের কপাট খুলিলেন, কপাট খুলিয়াই শবদেহের মত নিশ্চলনিস্পন্দ মনুষ্যদেহ দেখিয়া "মা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারশব্দ শুনিয়া প্রাতঃকালের সেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি শীর্ণকায়া যুবতী বাহিরে আসিলেন, তিনিও সম্মুখে শবদেহ দেখিলেন। তিনি কাঁদিলেন না,—দেখিয়া ধীরে সেই কাদামাটির উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া শবের নিকট যাইলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "মাসীমা! দেখ্‌তে পাচ্ছ না, ও কে!" বৃদ্ধা মাসীমা, দুঃখিনী সুরূপার এই কথা শুনিয়া সাহসে বুক

বাঁধিয়া ধীরে ধীরে শবের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুড়ীর নজর ভাল ছিল না, শবদেহটার কাছে বসিয়া পড়িলেন; চর্ম্মসার শুষ্ক হস্তে সেই দেহ স্পর্শ করিলেন, এবং চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "একি! এ যে আমার কাতু!" এই বলিয়া বুড়ী "বাবারে! কান্তিরে! তুই কোথায় গেলিরে" ইত্যাদি সুরে মড়াকান্না ধরিলেন।

সত্যসত্যই কান্তিচন্দ্র মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়াছিলেন। কেমন করিয়া তিনি নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিলেন, তিনিও জানেন না, কেহই জানে না। হয় ত দোপাটিকে খুঁজিতে যাইয়া মানসিক অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণবিভাত বিবেক-দীপ্তির ভিতর হইতে তিনি সুরূপার মুখের ছায়া দেখিয়া বিহ্বলভাবে ছুটিয়া আসিয়া সুরূপার বাসস্থানের সম্মুখেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাই প্রণয়ের টান—রূপের নহে। বুড়ীর কান্নার রোলে পাড়াপ্রতিবাসী সকলে আসিয়া জুটিল, মূর্চ্ছিত কান্তিচন্দ্রও গাত্র ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন। সুরূপার মস্তকে অবগুণ্ঠন নাই, কাহাকেও দেখিয়া লজ্জা নাই, সুরূপা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া হাসিমুখে গিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিল। কান্তিচন্দ্র যেন ছোট শিশুটির মত তাহার করাকর্ষণে গুড়্ গুড়্ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

"হি হি তুই কে, তুই কি দোপাটি? হি হি আমি তোর সঙ্গে বনে যাব।" কান্তিচন্দ্র সত্যসত্যই পাগল হইয়াছে। একেবারেই উন্মাদ। কিন্তু স্বামীকে উন্মাদ অবস্থাতে পাইয়াও সুরূপা এখন সুখী। কেন না, সে যে স্বামীকে পাইয়াছে। উন্মাদ স্বামীর চড়-চাপড়-কিল সুরূপা হাসিমুখে সহ্য করে, আর তাঁহার সেবা

করে। সুরূপার সর্ব্বাঙ্গে কালশিরার দাগ, তথাপি সুরূপা স্বামীকে শিকল দিয়া বাঁধিতে পারে নাই। সুরূপা প্রায় বলিত, "আমার স্বামী আমার দেবতা, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, পরকালের সম্বল, আমি সেই স্বামীর সেবা করিতে পারিতেছি, আবার চাই কি? আমি পোড়াকপালী, জন্মান্তরে অনেক পাপ করিয়াছিলাম, তাই এমন স্বামী পাইয়াও হারাইয়াছিলাম, হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট। তবে ইন্দ্রতুল্য স্বামী পাগল হইল, সেও আমার পোড়া-কপাল।"

কান্তিচন্দ্রের উন্মত্ততার কথা ক্রমে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কেহ বলিল, "বেদের মেয়ে দোপাটি গুণ করিয়া বাছাকে পাগল করিয়াছে।" কেহ বলিল, "বেদের কর্ত্তামা রাগ করিয়া কান্তিবাবুর বুদ্ধি হরণ করিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট্ র‍্যাভেন্সা সাহেবও এ সমাচার জানিতে পারিলেন। তিনি কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সোজাসুজী কান্তিবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া সকলেই ধরা-বাঁধা করিয়া কান্তিবাবুকে বাহিরে আনিল। কান্তিচন্দ্র সাহেবকে দেখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পাগলের ঝোঁকের উপর কান্না, কান্তিচন্দ্রের রোদনের আর শেষ হয় না, নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। সাহেব কান্তিবাবুর হাত ধরিয়া মিষ্টবচনে বলিলেন, "কান্তি, তুমি কাঁদ কেন? তোমার চাকুরী বজায় আছে, তুমি আরোগ্যলাভ করিয়া চাকুরী করিবে। ভয় কি? আমি যতদিন আছি, ততদিন তোমাদের কোন ভয় নাই।"

কান্তিচন্দ্র তবুও কাঁদে—তবে সাহেবের মুখে মিষ্ট কথা শুনিয়া. কান্তিচন্দ্র অনেকক্ষণ পরে কথা কহিল।

"সাহের, আমার কি হবে? আমার দোপাটি কোথা গেল? আমার স্বরূপা কাঁদে কেন? আমি কি খাব?"

পাগলের মতি স্থির থাকে না, এই ভাবে অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিতে লাগিল। সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া পাগলের বকুনি শুনিতে লাগিলেন। শেষে যাইবার সময় স্বরূপাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমাদের ভাবনা নাই, যখন পাগল কাঁদিয়াছে, তখন তাহার নিজের অবস্থা বোধ হইয়াছে,—এখন রোগ অবশ্যই আরাম হইবে। খরচের জন্য যাহা প্রয়োজন হইবে, আমার নিকট হইতে আনাইয়া লইলেই চলিবে। তোমরা অস্থির হইও না।"

(১৪)

ভাদ্রমাসের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, নীল আকাশের তলে কে যেন সোনা গলাইয়া ঢালিয়া দিয়াছে, রৌদ্রের দিকে তাকাইবার যো নাই।

"মাগো দুটি ভিক্ষা দাও," মধ্যাহ্নগগনের তীব্র তেজকে ভেদ করিয়া কাতর বামাকণ্ঠে কে বলিল; "মাগো দুটি ভিক্ষা দাও।" কান্তিচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখের দরজা খুলিয়া গেল। বৃদ্ধা ভিখারিণী মাসীমাকে দেখিয়াই অনাহারক্লিষ্ট শুষ্কমুখে একগাল হাসিয়া বলিল, "বুড়ু মা! আমার ছুট মা কই?" এই বলিয়া ভিখারিণী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। স্বরূপা ভিখারিণীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল, সেই কারাগোলার বেদিনী বুড়ি। বেদিনী জম্‌কাইয়া গিয়া দাওয়ার উপর বসিল এবং বলিল "কাঁদিস্‌নি মা! তুই যে আমার ভাল মেয়ে, তুই কাঁদবি কেন?" বেদিনীর কথার আওয়াজ পাইয়া উন্মাদ কান্তিচন্দ্র কক্ষাভ্যন্তর

হইতে বাঘের ন্যায় লাফাইয়া বাহিরে আসিল ; আসিয়াই বজ্রমুষ্টিতে বেদেবুড়ীর চুল ধরিয়া বলিল, "দে বুড়ী, আমার দোপাটিকে ফিরিয়ে দে।" বৃদ্ধা বেদেনী কান্তিবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে বলিল, "ঐখানে চুপ ক'রে বস।" বৃদ্ধার সে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া পাগল কান্তিচন্দ্র ঠিক যেন বিড়ালের মতন ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিল। বেদেনীর প্রভাব দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল।

"আর কেন কষ্ট পাও মা! আগামী অমাবস্যের দিনে তোমার স্বামীর হাত ধ'রে সা-সাহেবের দরগায় যেও, তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ ক'র্‌বেন। মাগো! বোনের পাখী বেদেনীকে পুষ্‌তে আছে কি? তোমার স্বামী বোঝেন্‌নি। দোপাটিকে পুষেছিলেন, তাকেও রাখ্‌তে পার্‌লেন না, নিজেও ঠিক থাক্‌লেন না। আমরা মা নাগের জা'ত, আমাদের যতই দুধকলা দেবে ততই আমাদের বিষ বাড়্‌বে। যা'ক, তোমার ঘরসংসার আবার পাতিয়ে দিতে পার্‌লে আমি ওস্তাদের নিকট রেহাই পাই।" এই বলিয়া বেদেনী উঠিয়া গেল।

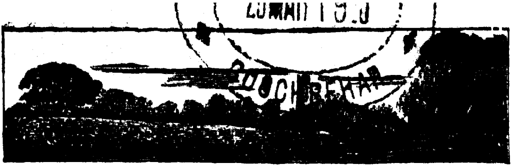
(১৫)

সা-সাহেবের দরগায় যাইতে হইবে শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট র‍্যাভেন্‌সা সাহেব নিজেই হাতীর বন্দোবস্ত করিলেন, লোকজন সঙ্গে দিলেন, যথেষ্ট অর্থও সুরূপার কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সুরূপা লোকজন লইয়া গৌড়ের গহন বনে সা-সাহেবের দরগায় উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে ঘন বন, বনের মধ্যে হুসেন-সাহেবের নির্ম্মিত বিরাট মসজিদ এবং তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সে মস্‌জিদের একটি ভূগর্ভস্থ ক্ষুদ্রকক্ষে বৃদ্ধ

মুসলমান সা-সাহেব বাস করিতেন। সেই নির্জ্জন গহন বনে তাঁহার অন্ন কেমন করিয়া হইত, কে জানে? সুরূপা দূরে লোকজন ও হাতী রাখিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিয়া সেই পুরাতন মস্‌জিদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই সময়েই আনাভি-লম্বিত-শুভ্রশ্মশ্রু আগুল্‌ফ-চুম্বিত-জটাভার, গম্ভীরমূর্ত্তি, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ মুসলমান-ফকির সা-সাহেব সেইখানে দেখা দিলেন। তাঁহার হাতে তস্‌বী, অষ্টপ্রহর কল্‌মা জপ করিতেছেন। ফকির আসিয়াই কান্তিচন্দ্রের মস্তকে বামহস্ত অর্পণ করিলেন। বলিলেন, "কাফর, আরাম হো যাও।" সেই গম্ভীর আদেশবাণী শুনিয়া কান্তিচন্দ্র যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। আর বলিলেন, "রূপো! এ কি, এ কার রূপ? আমি কোথা?" ঠিক এই সময়েই নিবিড় অরণ্যানি হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" গান শুনিয়া কান্তিচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বটেই ত! যতদিন পারিয়াছি, নয়ন দিয়া রূপ দেখিয়াছি। যখন জ্ঞানহারা হইয়াছি, তখন মনে মনে মাঝে মাঝে সে রূপ ধ্যান করিতাম, তবুও সাধ মিটিত না। সুরূপা! আজ তোমায়ও বড় রূপসী দেখিতেছি, চল বাড়ী চল। আমার হৃদ্‌গত রূপের হুতাশন রাবণের চিতার ন্যায় অহরহ জ্বলিতেছে, তোমার অপার স্নেহের শীতল জলকণা সেচন করিয়া সে অগ্নিজ্বালা নিভাইতে চেষ্টা করিব। যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন রূপের ক্ষুধা থাকিবে বটে; পরন্তু আমি আর ক্ষুধার জ্বালায় পরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইব না। যিনি পরম রূপবান্, তাঁহারই ছায়া পাইয়া তোমরা রূপবতী, তাই তোমাদের দেখিয়া মেঘদর্শন-পিপাসু

চাতকের ন্যায় আমরা জ্ঞান-শূন্য হইয়া অনন্ত-শূন্যে উড়িয়া যাই। কিন্তু সামর্থ্যে কুলাইয়া উঠে না,—দেহীর মাটির দিকে টান থাকে, তাই অচিরে নীচে পড়িয়া যাইতে হয়। এইবার তুমি আমায় রক্ষা করিও। আমি রূপে পাগল হইয়াছিলাম। দোপাটির দুই পাটিই বটে; এক পাটি রূপময়, অন্য পাটি পশুত্বপূর্ণ। আমি পশুকে রূপের আলোয় দেখিয়াছিলাম, তাই পাগল হইয়াছিলাম। তোমার রূপ আছে, গগনোপান্তনিমগ্ন-সূর্য্যরশ্মিপ্রতিভাত মুদিতা উষার ন্যায় তোমার সুমধুর সুশীতল সুস্নিগ্ধ রূপ আছে! আমি রূপের জ্বালায় পুড়িয়াছি, সেই রূপের দাহক্ষত তোমার রূপের কৌমুদী-স্নানে শীতল করিব। যা-হবার তা হয়েছে, চল বাড়ী যাই। আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে, আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি, আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। ফকির! সেলাম্।"



মালতী।

(১)

সূর্য্যগ্রহণ। এমন গ্রহণ আর কখনও হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, শত বৎসরের মধ্যে এমন গ্রহণ আর হইবে না। তাই কলিকাতার আহিরীটোলার ঘাটে স্নানার্থীর বড়ই ভিড়। গঙ্গাবক্ষ হইতে ঘাটের দিকে তাকাইয়া দেখিলে মনে হয়, উপরের নীল আকাশ রাহুভয়ে ভীত হইয়া যেন নামিয়া আসিয়া গঙ্গাগর্ভে লুকাইতেছে। নরমুণ্ডশ্রেণী এতই ঘনবিন্যস্ত! সোপানের পর সোপান যেন পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মনুষ্যশ্রেণীর দ্বারা আচ্ছাদিত। দূর গঙ্গাবক্ষ হইতে মনে হয়, যেন বাস্তবিকই অনন্ত আকাশের অনন্ত অজ্ঞেয়তা মন্দাকিনীসলিলের অজ্ঞাত পবিত্রতায় মিশিয়া যাইতেছে। এক স্থানে, এক সময়ে, এক সঙ্গে অসংখ্য নরনারীর এই পাপনাশ ও পুণ্যসঞ্চয়ের স্পৃহা—এই পরলোকে সদ্গতি-লাভের লালসা, হৃদয়ের ভিতর কেমন-একটা অজ্ঞেয়ের গভীরতা জাগাইয়া দেয়!

শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সকলেই ঊর্দ্ধমুখে গ্রহণ দেখিতে চেষ্টা করিল। কেহ বলিল, "লাগিয়াছে।" কেহ বলিল, "কৈ

দেখিতে পাইলাম না।” কোন সুচতুর ব্যক্তি বলিল, “কেন, ঐ যে নৈর্ঋত কোণে একটু কালি দাগ দেখা যাইতেছে। গ্রহণ-যোগ লাগিয়াছে, চল গঙ্গাস্নান করি।” যাহা হউক, কথায় কথায় লোক কিন্তু এইবার নামিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ এক-সঙ্গেই নামিতে লাগিল। এত আগ্রহ, এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে, কাহারও পার্শ্বে বা পশ্চাতে দৃষ্টি নাই, সকলেরই দৃষ্টি সম্মুখে,—ভাগীরথীর সলিলপ্রবাহের দিকে। যাঁহারা পুরশ্চরণ করিবেন, তাঁহাদের ত সুখের সীমা নাই; ঠেলাঠেলি করিয়া, হুড়াহুড়ি করিয়া তাঁহারা জলে পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিমদেশীয় মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীদিগের উৎকণ্ঠা যেন একটু অধিক বলিয়া বোধ হইল। ঘাটে ত তিল রাখিবার স্থান নাই। মানুষের নড়িবারও উপায় নাই। তাহার উপর স্নানের আগ্রহ। সকলেই আগে গিয়া জলে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে! সেই চেষ্টায়, সেই নরমুণ্ড-বিস্তারের উপর যেন একটা ঢেউ উথলিয়া যাইতেছে। হিন্দুস্থানিগণ এই উদ্বেলিত-নরমুণ্ড-বিস্তারকে যেন বিদীর্ণ করিয়া, দলিত-মথিত করিয়া, কোটালের বানের মত হুড়হুড় করিয়া গিয়া, জলে পড়িল। দুর্ব্বলদেহ বাঙালীনরনারী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া কেমন-যেন একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। কে কাহার ঘাড়ে পড়িল, কে কাহার পিঠে পড়িল, কিছুরই নির্ণয় রহিল না।

একটি বাঙালী যুবক ঘাটের এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল; তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয়, তাহার আগ্রহও নাই, উৎকণ্ঠাও নাই, গঙ্গাস্নানজনিত দুর্লভ পুণ্যলাভের লালসাও নাই। ডান কাঁধে গামছাখানি ঝুলিতেছে, আর যুবক উদাস অবসন্ন নয়নে চারিদিকে দেখিতেছে; এত ভিড়, এমন

ঠেলাঠেলি, এমনই মর্ম্মন্তুদ কাতর চীৎকার, যুবক যেন কিছুই শুনিতেছে না। সূর্য্য অর্দ্ধেকেরও অধিক রাহু কবলিত। আকাশে দূরে দূরে খই-ফুটার মত এক একটি তারা ফুটিতেছে; বিগলিত-স্বর্ণবর্ণ রবিকিরণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হইতেছে; বৃক্ষাদির ছায়া অতি ঘন, অতি কৃষ্ণবর্ণ; পত্রমধ্যস্থ রবিকিরণ-সঞ্জাত আলোকের চিত্র আর চক্রাকার নাই, বৃক্ষতলে চন্দ্র-কলার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পক্ষিকুল এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া ত্রাসে কেবল চীৎকার করিতেছে। ধীর দক্ষিণ পবনের সে উষ্ণতা নাই, এখন গায়ে লাগিলে শীতল স্পর্শে দেহ কণ্ট-কিত করিয়া তুলিতেছে। যুবকের চিত্তে কোন অনুভূতিই নাই।

যুবক ঘাটের একটি রাণার উপর দাঁড়াইয়াছিল। এক-প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ কেহ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। কে যেন আসিয়া তাহার কোমর ধরিল; মনুষ্যভরে বামে হেলিয়া রাণা হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সহজ আত্মরক্ষার চেষ্টায় যুবক যেন জোর করিয়া দক্ষিণে হেলিয়া কাহাকে ধরিল এবং বলিল, "ছি, অমন করিয়া কি ঘাড়ে পড়িতে হয়? নীচে কাঁকর-পাথর রহিয়াছে, পড়িয়া গেলে আমায় চোট লাগিত।" অজ্ঞাত ব্যক্তি বলিল, "আমারও দাঁড়াইবার স্থান নাই।" সেই কথা শুনিয়া যুবক চমকিতভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করিল। সূর্য্য প্রায় রাহুকবলিত, এক-টুকরা ভানুখণ্ড যেন অতিকষ্টে রাহুগ্রাস হইতে বাহিরে রহিয়াছে, আর তাহারই ম্লান একটি রেখা সেই ব্যক্তির মুখের উপর পড়িয়াছে। একি এ! এ যে রমণীমুখ! ঐ উপরে আকাশের সূর্য্যও যেমন রাহুকবলে

বেপমান ও ম্লান, এই ধরাতলের গঙ্গাতীরের যাত্রিমুখও তেমনই ত্রাসে বেপমান ও ম্লান। সূর্য্যের অপচীয়মান কিরণ এত দুঃখেও এই কামিনীমুখকমলকে সমুজ্জ্বল করিতে ছাড়িছে না।

যুবক এই মুখ খানির প্রতি তাকাইল। রমণীরও বড় বড় ঢল্‌ঢলে চক্ষু—দুইটি যুবকের উদাস নয়নের স্বপ্নাবৃত দীপ্তির উপরে গিয়া পড়িল। উভয়েরই মুখের উপর সূর্য্যকিরণে যেন সোণা ঢালিয়া দিয়াছে। উভয়েরই মুখের উপর অপূর্ব্বভাবের একটি ক্ষীণ রক্তিমরেখা পরিস্ফুট হইয়াছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমায় কি ব'ল্‌ছিলেন ?"

রমণী যেন একটু অপ্রভিত হইয়া লজ্জায় নয়নযুগল নিজ বক্ষের উপর সংস্থাপিত করিয়া বলিল, "এমন কিছু নয়, আমার দাঁড়াইবার জায়গা নেই; লোকের ভিড়ে মাকে হারিয়ে এই দিকে এসে প'ড়েছি—আপনার ঘাড়ের উপরই এসে প'ড়েছি। আপনি কিছু মনে করিবেন না, আমায় এখানে একটু দাঁড়াইতে দিন।" যুবক উত্তর করিল, "এত ভিড়ে ত স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারা যাবে না, আপনি যদি বলেন ত আপনাকে আমি স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারি।" যুবতী বলিল, "সেই ভাল। আমার কেমন সর্দ্দিগর্ম্মির মত হয়েছে। একটু খোলা জায়গা পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আপনি কি ভিড় ঠেলে যেতে পার্‌বেন ?" যুবক শুষ্কভাবে উত্তর করিল, "দেখা যাক্।"

এমন সময় হঠাৎ যেন চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল! কেমন যেন একটা শব্দ চারিদিকে উঠিল। ক্ষণেকের জন্য বোধ হইল, যে একখানি ঘনকৃষ্ণ যবনিকা আকাশের কোল হইতে ধরাতল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়া সরিয়া গেল। ইহাই

চন্দ্রের ছায়া। আর তখনই কঙ্কণের ন্যায় চারিদিকে সূর্য্যের কিরণ ফুটিয়া বাহির হইল। এক একটা কিরণ যেন হঠাৎ ছুটিয়া অনন্ত আকাশের কোলে ডুবিতে লাগিল। এক একটি কিরণ কনকবল্লীর ন্যায় ঝুলিয়া ধরাতলে গড়াইয়া পড়িল। যেখানে কিরণ পড়ে, সেইখানেই সূর্য্যালোক, যেখানে কিরণ নাই, সেখানে সায়াহ্নের অন্ধকার! যুবক আর সেই রমণী কিছু ক্ষণের জন্য আকাশের অদ্ভুত শোভা অনিমিষ নয়নে দেখিতে লাগিল। সব নিস্তব্ধ, অগণিত মনুষ্যকণ্ঠ রবহীন। ভাগীরথীর জলকল্লোলও যেন শান্ত। আলোক ও ছায়ার এই ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি খেলা—ব্যোমবৃন্দাবনে কৃষ্ণবলরামের এই বাল্য-লীলা যে দেখিল, সেই মজিল,—অবাক্ অনিমিষ নয়নে কেবলই দেখিতে লাগিল।

অল্পক্ষণপরেই চন্দ্রকলার ন্যায় সূর্য্যের একটা অংশ ফুটিয়া বাহির হইল, আর অমনি চারিদিক্ আলোকে সমুদ্ভাসিত হইল। স্তব্ধ প্রকৃতি সজীব হইয়া উঠিল। পশুপক্ষিকুল কলরব করিয়া উঠিল। স্তব্ধ মনুষ্যকণ্ঠ যেন একতানে একপ্রাণে হরিনাম করিয়া উঠিল। অসংখ্য খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। সেই বিরাট্ শব্দ গগন ভেদ করিয়া শব্দধর্ম্মি-ব্যোমক্রোড়ে গিয়া উঠিল। যুবক বলিল, “এইবার চল, উপরে যাই।” রমণী বলিল, “স্নান না করিয়া এখুনি যাবেন কেন?” যুবক উত্তর করিল, “বটে ত, স্নান ক’র্‌তে হবে। চল দুজনেই স্নান করিয়া আসি।” সে ভিড়ে আর লজ্জাসম্ভ্রম থাকে! রমণী স্বহস্তে যুবকের হস্ত-ধারণ করিয়া গঙ্গাজলে গিয়া’ দাঁড়াইল। যুবকের হাত ধরিয়া বলিল, “আপনার কোঁচার কাপড়ের সঙ্গে আমার আঁচল বাঁধিয়া

রাখুন। কি জানি, আবার যদি ছিট্‌কে পড়ি ত এবার ডুবিয়া মরিব।" যুবক পূর্ব্ববৎ শুষ্কভাবে বলিল, "বেশ।" রমণী অমনি কম্পিতকায় যুবকের কোঁচার সহিত নিজের অঞ্চল বাঁধিয়া রাখিল। দুই জনে একত্রে স্নান করিল। দেবতাবন্দনা একত্রেই করিল। মুক্তিস্নানও একত্রে হইল। খরদীপ্তিশালী সূর্য্য এখন ঝক্‌ঝক্ করিয়া ভাগীরথী-বীচিবিস্তারের উপর ঝলসিতেছে, প্রথম ফাল্গুনের সূর্য্যতেজে এখন যেন মস্তক তাতিয়া উঠিতেছে। অনেকেই এই সময় গঙ্গাগর্ভ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়াছে। রমণী বলিল, "বড় রৌদ্র, চল উপরে যাই।" ধীরে ধীরে উভয়ে জল ছাড়িয়া উঠিল।

রমণীর সূক্ষ্ম আর্দ্রবস্ত্র দেহের উপর যেন মিশিয়া গিয়াছে। কেশদাম-বিগলিত বিন্দুবিন্দু জলকণা সূর্য্যকিরণবিগলিত কনক-বিন্দুর ন্যায়—কপালে, ভ্রূর উপরে, নাসাগ্রে, চিবুকপার্শ্বে যেন ঝুলিতেছে, দুলিতেছে, খেলিতেছে, চলিতেছে। নয়নের প্রতি পল্লবের উপর সূক্ষ্ম জলকণা প্রথম-উষারাগ-রঞ্জিত শিশিরকণার ন্যায় শোভা পাইতেছে; আর রমণীমুখ লজ্জায়, সম্ভ্রমে, উৎ-কণ্ঠায়, উদ্বেগে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় ঢল্‌ঢল্ করিতেছে। অপরূপ দেহলাবণ্য! প্রথম যৌবনোদ্গমের ঐশ্বর্য্যপ্রভায় সর্ব্বাঙ্গ হইতে কেমন একটা কিসের জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে! এমন করিয়া, এমন অবস্থায়, এমন ভাবে রমণীরূপ যুবক আর কখন দেখে নাই। আজানুপরিলম্বিত কেশদাম পৃষ্ঠের চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে; রাহুর গ্রাসের ন্যায়, চন্দ্রের ছায়ার ন্যায়, সিক্ত কেশপাশ প্রথম যৌবনের অপূর্ব্বদীপ্তি যেন বাঁধিয়া-চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর সেই কেশদামের ভিতর দিয়া

গ্রীবার গঠনসৌন্দর্য্য, পৃষ্ঠের বর্ণগৌরব, কটিতটের লাবণ্যচ্ছটা, যুবক ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাইতেছে। প্রতি গ্রীবাভঙ্গিতে কেশ নড়িতেছে, এবং তাহার নূতন নূতন বিন্যাসের সহিত দেহের নূতন নূতন শোভা অংশে অংশে দেখিয়া যুবক কৃতার্থ হইতেছে। যুবক অনিমেষ নয়নে সব দেখিল; যুবতীর—যুবতীই বা বলি কেন,—কিশোরীর অঞ্চলে টান পড়াতে বুঝিতে পারিল, যুবক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হংসীর ন্যায় গলা বাঁকাইয়া বক্রনয়নে যুবকের প্রতি তাকাইয়া যুবতী বলিল,—"অমন ক'রে দাঁড়িয়ে যে, আসুন্ না, উঠে আসুন্ না!" যুবক একটু যেন লজ্জিতভাবে বলিল,—"এই যাচ্ছি।" ধীরে ধীরে দুইজনে উপরে উঠিল। যুবক একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিল। এমন সময় যুবতী বলিল,—"আমার আর কাপড় নেই, আমি ভিজে কাপড়েই বাড়ী যাব। কই আপনারও ত অন্য কাপড় দেখ্ছি নে, আপনাকেও ভিজে কাপড়ে যেতে হবে। আপনি আমার বাড়ীতে আসুন, সেখানে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।" এমন সময় গাড়োয়ান বলিল,—"বাবু, কোথায় যাব?" যুবক এইবার সোৎকণ্ঠায় যুবতীর প্রতি তাকাইল। যুবতী যুবকের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গাড়োয়ানের প্রতি তাকাইয়া বলিল,—"এই কাছেই যেতে হবে, শোভাবাজারে।"

(২)

"ওকি লো! গাঁটছড়া বেঁধে কাকে নিয়ে এলি?"

উত্তর। যাকে নিয়ে আস্তে হয়, তাকেই।

"মরণ আর কি!"

শোভাবাজারের এক গলির ভিতরে একটি বাড়ীর উঠানে এক বর্ষীয়সী রমণীর সহিত আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা রমণীর এইরূপ কথা হইল। বর্ষীয়সী যুবতীর মাতৃস্থানীয়া—জননী কি না জানি না, তবে যুবতী তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকে। বর্ষীয়সীও যুবতীর প্রতি মাতৃস্নেহের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াই যুবকের মনে কেমন-একটা খট্‌কা লাগিল। ভাবিল, "একি! আমাকে এ কোথায় লইয়া আসিল! এ কাহার বাড়ী!"

যুবতী বলিল, "মা! আমাকে একখানি শুক্‌না কাপড় দাও, ইহাঁকেও দাও। ভিজে কাপড়ে আমরা অনেকক্ষণ আছি।"

মাতা নীরবে দুইখানি কাপড় আনিয়া দুইজনের হাতে দিল। দুই জনেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এক স্থানে আসিয়া বসিল। বৃদ্ধা কোন কথা না বলিয়া দুই জনকে দুইথাল জলখাবার আনিয়া দিল। যুবতী নিজের ভোজনপাত্র হস্তে লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। যুবক একলা বসিয়া রহিল। যুবতী কতকক্ষণ পরে পাণ চিবাইতে চিবাইতে সেই ঘরে আসিল। "একি এ! আপনি এখনও একটুও জল খান নাই!"

যুবক। তাই ত, আমি খেতে ভুলে গিয়েছি, এই খাচ্ছি।

যুবতী হাসিয়া যুবকের কাছে গিয়া বসিল এবং এটি খান, ওটি খান, সেটি খান বলিয়া নানা ছলে যুবককে সকল মিষ্টান্নগুলিই খাওয়াইল। জলখাওয়া শেষ হইলে যুবতী যুবককে লক্ষ্য করিয়া সাগ্রহে বলিল, "আপনার ত আজ এখনও আহার হয় নাই। আপনি সন্ধ্যার পর আমাদের এখানেই আহার করুন না!"

এইবার যুবক যেন থমকিয়া ধড় ফড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। “না, না, আমাকে এখুনি যেতে হবে। আমার জন্মে আমার মা অপেক্ষা কচ্ছেন।” এই বলিয়া যুবক সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যুবতীও ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। আর কেমন-একটু যেন বিশ্রান্ত চক্ষে যুবকের প্রতি তাকাইয়া রহিল। দুইজনেই দুই জনকে অনেকক্ষণ দেখিল। যুবতী অতি ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে, যেন বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল,—“আপনি আবার আস্‌বেন ত?” যুবক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আচ্ছা, আস্‌ব।”

“একি! এ যে বেশ্যা! আমি কাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলাম। বেশ্যার এত রূপ হয়? এত লাবণ্য, এমন পবিত্রতাও হয়? এ কি বেশ্যা,—না, না, বেশ্যা হইবে কেন? আমার ভুল হইয়াছে। হ'লই বা বেশ্যা, আমি ত এমন আর কখন দেখি নাই,—আবার দেখিব। কেবল দেখিব বই ত নয়, তাহাতে দোষ কি? না, না, না, আমি বেশ্যাকে দেখিতে পারিব না। মা জানিতে পারিলে কি ভাবিবেন! সে দুঃখিনী বিধবার আমিই ত একমাত্র অবলম্বন।—দেখিলে দোষ কি? আমি আবার দেখিব, —আর একবার দেখিব। একটিবার নয়ন ভরিয়া দেখিলে আমার পঁচিশ বৎসরের পুণ্যপ্রভা কি একেবারেই মলিন হইবে? ভাখে ত সকলেই, আমি দেখিব না কেন? আবার দেখিব।”

এইভাবে হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে যুবক নিজের বাসাবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। যুবকের পদশব্দ শুনিয়াই বাটীর ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন, ‘কে, রাসু এলি? আমি কতক্ষণ মুখ শুকিয়ে তোর জন্মে ব'সে রয়েছি, আর কি বাবা এ বয়সে উপোষ সয়? একাদশী, একাদশীর পর

শিবচতুর্দ্দশী, আবার আজ এই গেরণ; এ বয়সে এত উপোষ কি সহ্য হয় বাবা! তোকে বলি বিয়ে কর্, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসুন,—তাঁর সংসার বুঝে নিন্, আমি তোদের দু'জনকে সুখী দেখি, আর কেবল মালা জপ করি! তুই ত আমার কথা শুন্‌লিনে, ইংরেজি শিখে, কেমন যেন ধিঙ্গি হ'য়েছিস্। যে জলপানি পেয়ে এত টাকা রোজগার করে, সে সত্যিসত্যি রোজগার ক'রতে লাগলে কি ঘরে আর টাকা ধ'রবে। আমার আশীর্ব্বাদ কি বৃথা হবে, এম্নিই কি চিরদিন যাবে!

বৃদ্ধা আরও কত বকিতেন; তিনি প্রত্যহ পুত্রকে বিবাহে সুমতি দিবার জন্য এমনই ছোট ছোট বক্তৃতা করিতেন। অদ্যও তাহারই সূচনা হইতেছিল। কিন্তু রসময় শুষ্কভাবে বলিল, "মা, আমায় একখানি কাপড় দাও।" কথা শুনিয়া বৃদ্ধা পুত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কেন তোর পরণে ত শুক্‌নো কাপড় আছে? ও কাপড় কার? তুই কি গঙ্গাস্নানে যাস্‌নি? তোর কাপড়খানা কোথায়?" রসময় মায়ের কথা শুনিয়া একটু যেন শিহরিয়া উঠিল, সকল ঘটনা তাহার মনে পড়িল,—কি বলিবে সহসা স্থির করিতে পারিল না। শেষে যেন থতমত খাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে, এই,—এই,—এই,—সে কাপড়খানা আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে এসেছি; তাদেরই একখানা কাপড় পোরে এসেছি।" বুড়ী তীব্রভাবে বলিলেন, "তবে আবার কাপড় চাচ্চিস্ কেন?" রসময় আবার থতমত খাইয়া বলিল, "তাদের বাড়ীর কাপড়খানা পোরে ভাত খাব!" অগত্যা বৃদ্ধা একখানি কাপড় আনিয়া দিলেন। রসময়

মাতৃসন্নিধানে জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই, আজ বিধির বিপাকে তাহাও কহিয়া ফেলিল। হায় রূপ!

(৩)

রসময় মিত্র উচ্চকুলীনবংশোদ্ভব কায়স্থ সন্তান। পিতার কলেক্টরি আপিসে সামান্য চাক্‌রী ছিল, এক পুত্র রসময়কে তিনি অতি যত্নেই প্রতিপালন করিতেন। রসময়ের ভাগ্যে কিন্তু এ পিতৃযত্ন বহুদিন ভোগ হয় নাই; তাহার পাঁচবৎসর বয়সেই তাহার পিতার পরলোক হইয়াছিল। দুঃখিনী মাতা একপ্রকার ভিক্ষা করিয়াই বালক রসময়কে মানুষ করিয়াছিলেন। রসময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০ কুড়ি টাকা জলপানি পাইয়াছিল। সেইবার বৃদ্ধার দুঃখ দূর হইয়াছিল। পর পর সকল পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রসময় বেশ মোটা জলপানি পাইত, বৃদ্ধার সংসার সচ্ছল হইয়াছিল। রসময় একালের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ উচ্চশিক্ষিত যুবক, তাহার মনে অনেক উচ্চভাব ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উচ্চাশায় তাহার বুক দশহাত ফুলিয়া উঠিত। রসময় সাধনশীল হিন্দু না হইলেও, পবিত্র-চরিত্র—পবিত্র-চিত্ত ছিল। মাতা যখন তাহাকে বিবাহ করিবার অনুরোধ করিতেন,—এ অনুরোধটা বৃদ্ধা প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা করিতে ভুলিত না,—তখন ম্লানমুখে রসময় বলিত, "সংসারে আমাদের আর কে আছে মা, কার ভরসায় বা বিয়ে করি! আশীর্ব্বাদ কর, শিগ্‌গির যেন টাকা রোজগার করিতে পারি, উকীল হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, তোমার চিরজীবনের সকল সাধ—সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করি। তার পর ত বিবাহ, কেমন!" বৃদ্ধা প্রত্যহ পুত্রের এই প্রকারের যুক্তিজাল শুনিতেন এবং

প্রত্যহই পুত্রের সহিত প্রথমে বিবাদ করিয়া পরে আবার তিনি নিজেই পরাজয় মানিয়া সরিয়া যাইতেন। এতদিন এইভাবেই মাতাপুত্রের সংসার চলিয়াছিল, আজ কিন্তু পুত্রের মনে এক নূতন প্রবাহ ছুটিয়াছে, নূতন জোয়ারের প্রথম ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। আজ রসময় একটু যেন বিরূপ। বৃদ্ধা পুত্রকে সেই পুরাণ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের মুখে সে পুরাতন যুক্তি শুনিতে পাইলেন না! তাই একটু যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁরে রাসু, তোর কি অসুখ কোরেছে?" পুত্র উত্তর করিল না, "দাও ভাত দাও।"

* * * *

প্রায় এক পক্ষ কাটিয়া গিয়াছে, এই একপক্ষ কাল যুবক রসময় নিজের মনের সহিত বিষম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালাইয়াছিল। এক-একবার সেই কাপড়খানি বুকে করে, হাতে করে, আবার তাহা রাখিয়া দেয়। এক একদিন কাপড়খানি হাতে করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, আবার ফিরিয়া আসে। যাই যাই করিয়া তাহার যাওয়া হয় না, দেখি দেখি করিয়া তাহার দেখা হয় না। কিন্তু রসময়ের মন যে শত অস্ত্রাঘাতে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। রসময় কখন কাঁদিয়াছে, কখন বা নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেকে শত ধিক্কার দিয়াছে। আবার কখনও বা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মনের সকল খেদ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

"না, কাজটা ভাল হ'চ্চে না। কাপড়খানা ত আমার নয়। কাপড়খানা ত ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে। আজই যাব,—এখুনি যাব।" এই বলিয়া যুবক ত্বরিতপদে শোভাবাজারের দিকে চলিল।

পূর্ণিমার রাত্রি। বসন্তের পূর্ণিমা, কলিকাতার ধূলিসমাচ্ছন্ন পথেও একটু-কেমন-যেন মিঠে হাওয়া বহিতেছে। যুবক সতেজে শোভাবাজারের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় সেই বাটীতে প্রবেশ করিল। একেবারে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। গ্রহণের দিন যে কক্ষে আহার করিয়াছিল, সটান সেই কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কক্ষে যে কেহ আছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যুবক একটু-কেমন বিকৃত কণ্ঠশব্দ করিয়া সাড়া দিল, যুবতী অমনি আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক যুবতীকে দেখিল—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ দুইজন দুইজনকেই দেখিল। নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় দুইটি রূপের শিখা মুখোমুখি হইয়া কতক্ষণ স্থির হইয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রণয়ের অনুকূল সমীরসন্তাড়নে শেষে দুইজনেই একসঙ্গে এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, স্থির-শিখা যেন দুলিয়া উঠিল। যুবতী ধীরে ধীরে বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন না।" যুবক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বিহ্বল, বিভোর হইয়া, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

কক্ষ অন্ধকারময়, প্রদীপ বা ল্যাম্প্ কিছুই নাই, কেবল বাতায়নপথে এক-টুকরা চাঁদের কোণা ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই চাঁদের আলোয় যুবক দেখিল, যুবতী যেন বৃন্তচ্যুত যূথিকার ন্যায় শুকাইয়া গিয়াছে।

মোজেস্ জনশূন্য ভীষণ মরুভূমি অতিক্রম করিবার সময় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার যাদুভরা যষ্টির দ্বারা এক শুষ্ক প্রস্তর-

খণ্ডকে আঘাত করিয়াছিলেন। সেই আঘাতে প্রস্তরের চিরশুষ্ক বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া অনাবিল স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহ কুলকুলরবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। মোজেসের তৃষ্ণা দূর হইয়াছিল। রসময়ও সংসারমরুতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই তৃষ্ণার তাড়নায় এতদিন কতবার নিজের হৃদয়কে আঘাত করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে আঘাত এতদিন ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রণয়ের যাদুযষ্টি না হইলে দেহীর পাষাণবক্ষ বিদীর্ণ হয় না। রসময় সেই গ্রহণের দিন হইতেই এ যাদুযষ্টি লাভ করিয়াছিল। তাই আজ যুবতীর শুষ্ক, বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া, তাহার হৃদয় ফাটিয়া শতমুখে প্রীতির শতধারা ছুটিল,—তাহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। ডুবাইয়া ফেলিল, কিন্তু তৃষ্ণা তাহাতে আরও বাড়িয়া উঠিল। তৃষ্ণামাত্রেই যাতনা আছে, রসময়ের এ তৃষ্ণাতেও যাতনা না থাকিবে কেন ? তবে রসময়ের এ তৃষ্ণায় যে যাতনা, সে যাতনা সুখেরই যাতনা। কে জানে এ কেমন তৃষ্ণা ! রসময় সামলাইতে পারিল না, সহসা যুবতীর কাছে বেঁসিয়া তাহার হাত ধরিল। কি বলিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "এই নাও, তোমার কাপড় এনেছি।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুবতী বলিল, "তুমি এলে যে ? আমি ভেবেছিলাম, আর বুঝি আস্‌বে না। বেশ্যা জেনে আমাকে আর দেখা দেবে না। বেশ্যা কি এতই খারাপ্ !"

রসময়। না, না, তা নয়, তুমি বেশ্যা কেন ? আমি আস্‌তে পারিনি। বাড়ীতে বুড়ো মা আছেন, চাক্‌রাণী ত রাত্রিতে থাকে না। মাকে একলা রেখে আসিই বা কেমন কোরে !—

যুবতী। দিনের বেলা আস্‌লে ত পারতে। আসল কথা

তা নয়; আমি যে বেশ্যা; বেশ্যাকে যে তোমরা ছোঁও না। আমি বেশ্যা-পুত্রী বটে, কিন্তু বেশ্যা এখনও হই নাই। বেশ্যার কন্যা হওয়াও কি এতই দোষের? সে দোষ ত আমার নয়।

রসময়। ছিঃ অমন কথা কি বোল্‌তে আছে?—তুমি বেশ্যা হ'তে গেলে কেন? আমি কেন আসিনি, তা তোমায় কেমন কোরে বোল্‌বো! না এসে যে কত কষ্ট পেয়েছি, তাই বা তোমায় কেমন কোরে বোল্‌বো। তুমি বোল্‌ছো তুমি বেশ্যা; কিন্তু তুমি কি বেশ্যা?—না না, তুমি ত বেশ্যা নও। বেশ্যা হ'লে, তোমার দেহের ভিতর থেকে এমন-একটা জ্যোতি ফুটে উঠ্‌বে কেন?—তুমি বেশ্যাই হও, আর কুলনারীই হও, তোমার পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় কেবল দেখিব,—দেখিয়া সুখী হইব।

যুবতী। না, না, না, বেশ্যাকে দেখিও না; আমি বেশ্যা—বেশ্যাকে স্পর্শ করিও না। হাতের জল অশুদ্ধ হইবে। তোমার বুড়ো মায়ের তুমিই একমাত্র অবলম্বন।

রসময়। অমন কথা বোলো না। অমন কথা তোমার মুখে শুন্‌লে আমি বড় কষ্ট পাই।

যুবতী। তুমি ত সব জানো না। আমাদের অবস্থার কথা তুমি ত কাহারও মুখে শুন নাই। বেশ্যার দুঃখ তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? দেখ, আমি বেশ্যার গর্ভজাতা কন্যা, আমার এখনকার এই মা আমার একমাত্র অবলম্বন, অভিভাবকের মধ্যে ইহসংসারে আমাদের আর কেহই নাই। আর এক অবলম্বনের মধ্যে অর্থ। এই দেহ বেচিয়া আমাদিগকে সেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। তোমরা আমাদিগকে দেখিতে পার না, পতিত জীব বলিয়া

সমাজ আমাদের কোন সমাচার রাখে না, আমাদের কষ্ট দেখিলে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সমাজ আমাদিগকে অবহেলা করে। আমাদের দুঃখ অনন্ত।

রসময়। চুপ কর, ও সব কথা আমাকে বোলো না, আমি পাগল হব।

যুবতী। না, না, আগে আমার সকল কথা শুন, আগে আমার সকল কথা শেষ করিতে দাও। দেখ, আমাদের টাকা চাই, মাকে দিবার জন্য টাকা চাই; নিজের বার্দ্ধক্যে জীবনধারণ করিবার জন্যও টাকা চাই, রূপের হাটে রূপ বেচিয়া তাই আমাদের রূপার টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। আমারও তাহাই করিবার কথা। অন্তত মায়ের ত সেই ইচ্ছা। আজ তিন বৎসর এই মা আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন, উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া ও গান বাজনা শিখাইয়াছেন। মা আমার পিছনে টাকা খরচ কোর্‌তে কসুর করেন নাই। আমি মায়ের বড় আশার সামগ্রী। মায়ের এখন বার্দ্ধক্য, এখন আমি তাঁহাকে টাকা না দিলে, আর কে দিবে?

রসময়। থাম, আর আমাকে পাগল করিও না। অর্থাভাবে আমি যেমন কষ্ট পাইয়াছি, এ সংসারে বুঝি আর কেহ তেমন কষ্ট পায় নাই। আমি এখনও নিঃস্ব, এখনও হাওয়ার উপর ভাসি-তেছি। আমি তোমার কি করিব?

যুবতী। তুমি কিছু কর আর না কর, আমাকে টাকা রোজগার করিতেই হইবে। অন্তত টাকা-রোজগারের আসল বিদ্যাটা শিখিয়া রাখিতেই হইবে। তোমারও বৃদ্ধা মাতা, আমারও বৃদ্ধা মাতা। তোমার মা-ও তোমার রোজগার খাইবেন বলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া আছেন, আমার মা-ও বড় আশায় বুক বাঁধিয়া

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। কিন্তু আমাদের জ্বালা জুড়ায় না, তোমাদের জ্বালা জুড়াইবার উপায় আছে।

রসময়। থাম, থাম, আমি যেমন করিয়া পারি, তোমাকে টাকা আনিয়া দিব। তুমি আমার। আমি যে তোমায় ভাল বাসি। এই পনেরো দিন সেই ভালবাসার বেগকে চাপিবার জন্য আমি আমার হৃদয়কে খণ্ডখণ্ড করিয়াছি, আমি আর পারি না। তুমি বেশ্যা হও, আর যাই হও, তুমি আমার! তুমি আমার না হইলে, আমি মরিব,—পাগল হইব! আমার বৃদ্ধা মাতা অনাদরে অপঘাতে মরিবেন।

যুবতী। আমিও তোমার, কিন্তু যেমন ভাবে তোমার হইতে হয়, তেমন ভাবে ত তোমার হইতে পারিতেছি না। তুমি জান না, এই পনেরো দিন আমিও কত কষ্ট পাইয়াছি। তোমাকে দেখিব বলিয়াই মনের কষ্ট। তুমি তোমার পরিচয় আমাকে দাও নাই, তোমার ঠিকানা আমাকে দাও নাই, এত বড় কলিকাতার মধ্যে কোথায় তোমার খোঁজ করিব! অথচ পলে পলে, নিমেষে নিমেষে তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আমি দশদিক্ অন্ধকার দেখিতাম; ইহার উপর এই মায়ের তাড়না। তোমাকে ভাল বাসিয়াছি বলিয়া তাড়না; ষোল বৎসর বয়স হইল, এখনও জাতীয় ব্যবসায় শিখিলাম না বলিয়াও তাড়না। কিন্তু আমি যে তোমায় ভাল বসিয়াছি, আমি এখন কি করিব!

এই বলিয়া যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল। রসময় বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। কিন্তু সে যত মুছায়, অশ্রুপ্রবাহ ততই সবেগে বাহির হইতে থাকে;—ছিন্ন ধমনী হইতে উন্মুক্ত রক্ত-

স্রোতের ন্যায় নয়নপথ দিয়া প্রীতির পূতধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। রসময় আর থাকিতে পারিল না, সে-ও কাঁদিয়া ফেলিল। রসময়ের চক্ষের অশ্রু দেখিয়া যুবতী যেন সর্পদষ্টের ন্যায় হেলিয়া-ঢলিয়া তাহার বুকের উপর পড়িল। এইবার চাঁদের আলো ঠিক যুবতীর মুখের উপর যেন ফুটিয়া উঠিল। রজতস্রাবের ন্যায় চন্দ্রের কিরণধারা,—স্ফটিকস্বচ্ছ, নির্ম্মল, শীতল কিরণধারা ;—আর যুবতীর মুখখানিও ওই চাঁদের মতই নির্ম্মল, শীতল, শুভ্র ; কিন্তু এখন যেন একটা-কিসের ছায়া-সম্পাতে একটু প্রভাহীন। চাঁদের আলো সেই প্রভাহীন মুখের উপর পড়িয়া একটি নূতন প্রভার সৃষ্টি করিল। রসময় গলিয়া গেল,—রূপের সেই সাগরসঙ্গমে বালুকাপিণ্ডের ন্যায় একেবারেই গলিয়া গেল। যুবতীর চিবুক ধরিয়া কত নাড়িল-চাড়িল, কত আদর করিল, কত খেলা করিল ; শেষে আর থাকিতে পারিল না, তাহার অধরে অতিসন্তর্পণে যেন কত ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে একটি চুম্বন করিল। এ সোহাগের অতি সুখে যুবতী নয়ন মুদিত করিল। এমন সময় যুবতীর মা আসিয়া একটু যেন রুক্ষস্বরে বলিল, "আবাগি! এইজন্যই কি তোকে দুঃখ করে মানুষ কোরেছি, কিছু শিখলিনি! ভদ্রলোক এসেছেন, একছিলিম তামাক দিতে বল্, এক ডিবে পাণ এনে দে ; একখানা ভালকাপড় পোরে এসে বোস্। সবতাতে যেন একটা ঢঙ। আঃ—আমার পোড়াকপাল! মশায়! আসুন।" এই বলিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বর্ষীয়সী আবার বলিল, "ও ঘরে চলুন, ও ঘরে আলো আছে।" সলজ্জভাবে রসময় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বর্ষীয়সীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

এই কক্ষে সামাদানে একটি বাতি জ্বলিতেছিল, মেজের উপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা, বিছানার চারিপার্শ্বে ছোট ছোট গিদ্‌দে বালিশ, তার উপর ঝালরের ওড় পরাণো এক একটা ছোট ছোট গাল বালিশ ; আর মেজের বিছানার পার্শ্বেই পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর আধহাত উঁচু গদি ও তোষক, তার উপর বিছানার চাদর, চাদরের উপর একটি সুন্দর শীতলপাটী। একদিকের ভিত্তিগাত্রে, ঠিক মাঝখানে, সোণালির কাজ-করা ঘন-কৃষ্ণ আবেষ্টনের মধ্যশোভিত, একখানা প্রকাণ্ড মুকুর ; মুকুরের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট দুইটি মার্বেলের টেবিল। টেবিলের উপর ছোট ছোট বেলওয়ারি পুঁতুল, বাসন, নানান্তর কাঁচের গেলাস, ডিক্যাণ্টার, নানাবর্ণ ও নানাকৃতি ফ্লাওয়ার্ ভাস্ প্রভৃতি কত-কি খুঁটিনাটি। দূর কক্ষের এক কোণে একটি সুন্দর মেহগ্নিকাষ্ঠের প্রেস্-আল্‌মারি ও দেরাজ, অপর কোণে একটি সুন্দর কাপড়ের আলনা ; দেওয়ালের চারিদিকে উলঙ্গ বা অৰ্দ্ধ উলঙ্গ ছবি। রসময় সভয়ে এই কক্ষের মেজের বিছানার উপর গিয়া বসিল। একবার যেন কাতরদৃষ্টিতে গৃহের সর্ব্বস্ব দেখিয়া লইল। বারাঙ্গনাকক্ষে উপবেশন তাহার পক্ষে এই প্রথম। চিরদুঃখী রসময় সংসারের কিছুই দেখে নাই, শিখে নাই। সে জানিত, নিজের বৃদ্ধা মাতাকে, আর চিনিত নিজের পাঠ্যপুস্তক-গুলিকে। বারাঙ্গনার বিলাসকক্ষ যে কি ভীষণ, তাহা সে জানিত না, বুঝিতেও পারিত না। তাই বিহ্বলদৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিতেছিল। এমন সময় যুবতী একখানি সবুজে রঙের বুটিদার মিহি বেণারসী শাটী পরিয়া নানালঙ্কার-ভূষিতা হইয়া, সেই ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। বত্রিশ ডালের ঝাড় যেমন

ঝল্‌মল্‌ করে,—নানাদিক্‌ দিয়া নানাবর্ণের ছটা যেমন বাহির হয়, যুবতীও—নানাবস্ত্রালঙ্কার-বিভূষিতা যুবতীও—তেমনই রূপের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। নীলনয়নের দীপ্তি, রাগরঞ্জিত কপোলযুগলের দ্যুতি, কম্বুকণ্ঠের অমল-ধবল-বর্ণচ্ছটা, হরিদ্বর্ণ বস্ত্রের শ্যামল শীতল আভা, আর সেই আভার ভিতরে দেহলতার লাবণ্যভাতি—যুবতীও বত্রিশ ডালের বেলোয়ারি ঝাড়ের মত রূপের বত্রিশপ্রকার প্রভা ফুটাইয়া ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রসময় অবাক্‌ হইয়া দেখিতে লাগিল। এত রূপও হয়! এত রূপ লইয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে! রসময় কেবল দেখিতে লাগিল। নিজকে ভুলিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে ভুলিয়া, পঁচিশ বৎসরের অর্জ্জিত পুণ্যরাশিকে উপেক্ষা করিয়া, রসময় সেই বেশ্যা-কন্যাকে কেবল দেখিতে লাগিল।

"যা মালতি! কাছে গিয়ে বোস্‌। অমন কোরে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন?"

মালতী দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল,—ভয়ে, লজ্জায়, উদ্বেগে, আকাঙ্ক্ষায়, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, আর ঘামিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া যেন একটু অপ্রতিভের মত তাড়াতাড়ি রসময়ের কাছে গিয়া বসিল।

(৪)

মালতী অনেকক্ষণ রসময়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, রসময়ও নয়নপুটে মালতীর অনিন্দ্য মুখকান্তি আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া পান করিতে লাগিল। দুইজনের দৃষ্টি তখন কতকটা লজ্জানম্র, কতকটা উদাস, কতকটা আগ্রহপূর্ণ, কতকটা ভীতিবিহ্বল,

কতকটা কত যেন অজানিত উৎকণ্ঠায় আকুল। দেখিতে দেখিতে,—দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উভয়ের চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত—কি-এক প্রমোদ-মদিরার আবেশে—কি-এক মোহস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল?—নীরব ভাষায় নয়নে নয়নে উভয়ের কত-কি প্রাণের কথা চলিতে লাগিল। শেষে মালতীর ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল,—সে হৃদয়ের রুদ্ধপ্রবাহ আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মালতী কথা কহিল। সে বীণাবিনিন্দিত—অমরাবতীর অপ্সরাকণ্ঠের মোহনমন্ত্রময় মধুরঝঙ্কারে রসময়ের হৃদয় ভরিয়া গেল। মালতী বলিল, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমাকে আমি এতদিন দেখি নাই,—তোমাকে এতদিন চিনিতেম না। কিন্তু তুমি যেন আমার কতকালের পরিচিত,—তুমি যেন আমার জন্মজন্মের স্বামী,—তোমায় দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার সেই জন্মজন্মের ভালবাসা জাগ্রত হয়েছে। তাই হে স্বামি! হে প্রভু! হে দেবতা! তোমায় আমি ভাল বাসিয়াছি। সে ভালবাসা কি, সে ভালবাসা কত, কেমন কোরে বোল্‌বো, কেমন কোরে জানাব। চল, দু'জনে আর এক দেশে গিয়ে থাকি। এ সংসর্গে থাক্‌তে আমার প্রাণ কেমন করে!

রস। কেমন কোরে যাই, আমার যে বুড়ো মা আছেন। আমি তাঁকে আমাদের সঙ্গে কেমন কোরে নিয়ে যাব?

মাল। হায় মা জগদম্বা, কেন আমি বেশ্যা হ'লেম! যদি আমি ভদ্রলোকের মেয়ে হ'তেম, যদি আমি তোমায় বিবাহ ক'র্ত্তে পাত্তেম, তা হ'লে আমি তোমার সকল বিষয়ের অধিকারিণী, সকল সুখের সুখিনী হ'তে পার্‌তেম। হায় মা সতি! হায় মা শঙ্করি! আমি বেশ্যার মেয়ে হলেম কেন! বেশ্যার মেয়ে হ'লেম ত

ভাল বাস্‌লেম কেন! ভাল বাস্‌লেম ত মলেম না কেন! বুঝি, আমার মরণেই সুখ!

রস। আমার কিন্তু মরণেও সুখ নাই। মরিলে যে কত সুখ, তাহা আমি জানি। তোমার মত স্বর্গের পারিজাতকে বুকে নিয়ে মরিতে পারিলে যে আরও কত সুখ, তা-ও আমি বুঝি; কিন্তু মরণে আমার অধিকার নাই। আমার বৃদ্ধা মাতা যে জীবিতা; মালতি! আমি তোমায় কেবলই দেখিব। যখন প্রাণ বড় কেমন করিবে, তখন ছুটিয়া আসিয়া তোমায় দেখিয়া যাইব। আজ যেমন দেখা দিয়াছ, এমনি করিয়াই আমাকে দেখা দিও।

মাল। তোমাকে দেখা দিবার জন্য, নিশিদিন তোমায় লইয়া থাকিবার জন্যই ত আমার এত সাধ! সে সাধে ভগবান্ বাদ সাধিলেন বলিয়াই ত আমার এত দুঃখ! দেখ, স্বর্গের পারিজাতই দেবতাকে দিতে হয়। তুমি আমার দেবতা, তোমাকে কি দিব? দিবার মত আমার ত কিছুই নাই,—আমি যে বেশ্যা! বরং তুমি আমায় একটু চরণধূলি দাও, আমি কৃতার্থ হই।

রস। তুমি যে আমার সব। আমি যে তোমায় কি দৃষ্টিতে দেখি, তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? তুমি আমার সংসার, তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার নন্দনকানন, তুমি আমার পারিজাত। বড় ক্ষোভ,—তোমার শোভা দেখিবার আমার অবসর নাই। একবার দেখিলে আমি পল, দণ্ড, প্রহর, কাল, সব ভুলিয়া যাই; কিন্তু আমি পথের ভিখারী, দুইমুষ্টি অন্নের জন্য সর্ব্বদাই কাতর। ইন্দ্রাণী তুমি, মর্ত্ত্যবাসী আমি, তোমার সেবা কেমন করিয়া করিব?

এইবার মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাতে নিজের মুখ চাপিয়া ধরিল; হাতের দুইখানি রতনচুরে বাতির আলো পড়িয়া করযুগল যেন জ্বলিয়া উঠিল;—যেন মালতীর মুখের ক্ষোভের তাপে জ্বলিয়া উঠিল। সেই সময়ে মালতীর মুখখানি ঠিক যেন বাতান্দোলিত কহ্লারের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল, কপোলযুগল কহ্লারের পল্লবের ন্যায় অনুরাগের আরক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, আর মস্তকবিলম্বিত একবেণী কহ্লারের নালের ন্যায় দুলিতেছিল। দেহের ভিতরের প্রণয়-প্রবাহ এক একবার উথলিয়া উঠিতেছে, আর মালতীর দেহলাবণ্য সমীরসন্তাড়িত সরোবরের স্বচ্ছসলিলের ন্যায় ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে। রসময় ইহাও দেখিল। যাহার রূপ আছে, তাহার হাসিতে রূপ, রোদনে রূপ, দুঃখে রূপ, রোষে রূপ, সকল অবস্থাতেই রূপ যেন উথলিয়া পড়ে। উন্মত্ত রসময় মালতীদেহে ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্যের ন্যায় কেবল রূপবৈচিত্র্য দেখিতে লাগিল।

এ ক্ষেত্রে পতঙ্গটা কে? মালতী না রসময়? মালতীর রূপের বহ্নিশিখা আছে, আর মালতীর দৃষ্টিতে রসময়ের দেহেও রূপের বহ্নিশিখা আছে। উভয়ের রূপের শিখায় উভয়েই পুড়িতেছে। উভয়েই ত পতঙ্গ। উভয়েই ত নয়নের জ্বালায় জ্বলিতেছে। নয়নই ত দেখায়। একবার দেখাইয়া সব ওলট্‌পালট্‌ করিয়া দেয়। মালতীর নয়নও দেখিতে জানিত, রসময়ের নয়নও দেখিতে জানিত। তাই উভয়েই নয়নে নয়নে পুড়িতেছে! অগ্নিশিখা অগ্নিশিখাকেই পোড়াইতেছে।

"মশায়! আপনি বাড়ী যাবেন না? রাত হ'য়েছে যে!" এই বলিয়া মালতীর মাতা সেই কক্ষের ভিতর উপস্থিত হইল। রসময়ও

অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখে মালতীর মাতাকে দেখিয়া হঠাৎ রসময়ের মুখখানি কালো হইয়া গেল। লজ্জায়, কি ক্ষোভে, কিসে এমন হইল, জানি না; তবে যেমন দেহের কোন স্থানে প্রবলবেগ রক্তস্রোত হঠাৎ বন্ধ হইলে সেই স্থানটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, রসময়েরও মুখের ভাব তেমনই হইল। রসময় যে প্রাণ-মন, প্রবৃত্তি-পিপাসা, আশা আকাঙ্ক্ষা মুখের উপর রাখিয়া মালতীকে দেখিতেছিল;—মালতীর রূপের আকর্ষণে রসময়ের হৃদয়ের এক একটি প্রবৃত্তি, এক একটি আকাঙ্ক্ষা, যেন উল্কা-পিণ্ডের ন্যায় তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছিল;—এমন সময়ে বাধা পাইলে সে সমুদ্ভাসিত বদনমণ্ডল অমার অন্ধকারে আবৃত হইবে না? রসময় গৃহের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল, আর মালতী আসিয়া রসময়ের হাত ধরিল এবং বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যাচ্চ যে! আমাকে এমন অবস্থায় ফেলে যাচ্ছ যে! তুমি ত জান না, এ বাটীতে আসা তোমার পক্ষে আর সহজ হইবে না! তুমি ত জান না, তুমি চলিয়া গেলে আমার উপর কি অত্যাচার হইবে! আমাকে কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এইটুকু জানিও, আমি তোমার,—তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আমি সব সহ্য করিব। আদর করিয়া তুমি আমাকে 'স্বর্গের কুসুম' বলিয়াছ, আমি সেই স্বর্গের কুসুমের ন্যায় তোমার যোগ্য হইবার চেষ্টা করিব।"

"মর্ আবাগী, কত ঢঙ্ শিখেছে! ঝাঁটার চোটে সব রস ঝেড়ে সাফ্ কোর্ব্বো। লেখাপড়া শিখিয়ে, গানবাজনা শিখিয়ে শেষে বুঝি এই বুদ্ধি হ'ল। যান্ গো, আপনি এখন ঘরে যান। অমন ক'রে কাঠের মুরদের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে না।

ভালমানুষের ছেলে, এ সব জায়গায় আসা তোমাদের কর্ম্ম নয়।" এইরূপে গঞ্জনা করিয়া মালতীর মাতা রসময়কে বাটীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

(৫)

রসময় রাস্তায় আসিয়া, খোলা বাতাস পাইয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। একটু স্থির হইয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, একবার মালতীর বাটীর দিকে তাকাইয়া, রসময় গন্তব্যপথে চলিল; যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল—

"আমি ত বেশ্যা চাই নাই! কই, কখন কোনদিনও ত বেশ্যা দেখি নাই! একি হ'ল! আমি দরিদ্রের সন্তান, ভিখারিণীর ছেঁড়া-ন্যাকড়ার পুঁটুলির একটি কাণা-কড়ি, আমার এমন কেন হইল? বেশ্যা কি এমনই হয়? এ কি ছলনা? না, তাও কি সম্ভব! আমার কি আছে যে, সে আমার সহিত ছলনা করিবে। মালতী ভালবাসে, নইলে অমন ভাবে কাছে আসে কেন! তবে মালতীর মা আছে, সে ত আমাদের মিলন হইতে দিবে না! অন্তত আজ্‌কের ব্যবহারে ত তাই বোধ হয়! মালতী কি মায়ের কথা এড়াইতে পারিবে? মালতী কি আমাকেই ভাল বাসিতে পারিবে! সে-ও ত আজই টাকার কথা তুলিয়াছিল। সে সব কি ক্ষোভের কথা? না— আমার মন জানিবার কথা? দূর হোক্! ও সব ভাবনায় দরকার নাই। আমি মালতীকে ভালবাসি, সে আমায় ভালবাসে; আমি তাকে চাই, সে-ও আমায় চায়;—এই চিন্তাই আমার পক্ষে সুখের। কোথায় সূর্য্যগ্রহণ, কোথায় গঙ্গাস্নান,—

কোথায় আমি, আর কোথায় মালতী!—এ সঙ্ঘটন কে করিল! হউক না, কেন মালতী বেশ্যা, সে যে রূপময়ী, আর আমি রূপের কাঙাল, সৌন্দর্য্যের ভিখারী, তাই আমি তার দ্বারে দাঁড়াইয়াছি। গঙ্গাস্রোত গোমুখী হইতে বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সাগর সঙ্গমে শতমুখী হইয়া মিশিবে;—হউক না কেন সমুদ্রজল লবণাক্ত। মালতী আমার, আমি তাহাতে মিশিয়া যাইব;—হউক না কেন সে বেশ্যা। আমি তারই! তাকে পাব না কি? পাব বৈ কি! তাড়িয়ে দিয়েছে, দিলেই বা, আমি মালতীকে আমার মনে ক'রেছি, সে আমারই হ'য়েছে। রূপ ভগবানের মাধুর্য্যের ছায়ামাত্র, সেই রূপ যাহার আছে, সে বেশ্যা হউক, নীচকুলোদ্ভবা হউক, সে রূপ সাধকের আরাধ্যা দেবী। মালতীর রূপ আমার মনের মতন, আমি সে রূপে আত্মহারা! মালতী আমার ইষ্টদেবী। আমি মালতীকে পাইব না? অবশ্য পাইব! মালতী আমার না হইলে কাব্য, ভাব, মাধুর্য্য—সবই মিথ্যা হইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রসময় বাড়ীর দিকে আসিতেছিল। মন মজিলে যুক্তির অভাব হয় না, হৃদয়ের চাকা একবার ঘুরিলে বুদ্ধির দড়ি টানিবার সামর্থ্যের অভাব হয় না। রসময়েরও সে অভাব হইল না। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি যোগাইয়া দিয়া তাহার প্রবৃত্তির পোষকতা করিতে লাগিল। কিন্তু যাই গলির মোড় ফিরিয়া নিজের বাসাবাড়ী দেখিল, অমনি রসময়ের বৃদ্ধা মাতাকে মনে পড়িল। তখনই হৃদয়ের মধ্যে আর একটা ওলট্-পালট্ খাইল। রসময় ঠিক এই সময়ে ভাবিল,—"মালতী সত্য-সত্যই যদি বেশ্যা হয়, তবে তার স্পর্শে ত আমার জাতি যাইবে! আমার বৃদ্ধা মাতার মুখে গঙ্গাজল দিবার অধিকার ত আমার

আর থাকিবে না! আমার মায়ের কি দশা হইবে? আমি যে তাঁর এক পুত্র! পরন্তু বেশ্যা হউক, আর যাহাই হউক, আমি যে মালতীর জন্য পাগল হইয়াছি, আমার ইহকাল-পরকাল সবই এখন মালতী! আমার এত ভালবাসা মাতা ত বুঝিবেন না। তাঁহার ইচ্ছা—আমি বিবাহ করি, বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া তাঁহার সকল দুঃখের অবসান করি। কিন্তু বিধিলিপি যে অন্য রকমের। আমি ত আমার নই, আমি এ মনের বেগ সামলাই বা কিরূপে? যদি মালতীকে আর দেখিতে না পাই, তবুও তাহাকে ভুলিতে পারিব না! আমি পাগল—আমি পিশাচ! আমার মায়ের মনে দুঃখ দিয়া,—মাতৃহত্যা করিয়া আমি রূপসাগরে ঝাঁপ দিব? কিন্তু তাহার যে রূপ আজ দেখিয়াছি, সে রূপ ত ভুলিবার নয়! সে রূপ ত আমার হৃদয় জুড়িয়া, প্রাণ ভরিয়া, কোজাগরের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কেবল জাগিয়াই থাকিবে। দূর হোক, যা হয় হবে!"

এইরূপে নানা তর্কবিতর্ক করিতে করিতে রসময় বাড়ী আসিল। বৃদ্ধা মাতা জরাজীর্ণা বটে, তাঁহার নয়নে তেমন জ্যোতি নাই, শরীরেও তেমন সামর্থ্য নাই, বুদ্ধিভ্রমও মাঝে মাঝে ঘটে; কিন্তু রসময়ের সকল ভাবান্তর, রসময়ের চক্ষের কোণে ক্ষীণ কালীর দাগটি পর্য্যন্ত, বৃদ্ধার ক্ষীণদৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। রসময়ের বিরূপভাব বৃদ্ধা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "হ্যাঁরে রাসু! তুই অমন হয়ে যাচ্ছিস্ কেন? কেমন অন্যমনস্ক থাকিস্, মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠিস্, মাঝে মাঝে কি বিড়্‌বিড়্ ক'রে বকিস্, কেবল ঘুরে বেড়াস্, সময়ে খাস্‌নি, সময়ে শুসনি, বিছানায় শুয়ে জেগে থাকিস্, অমন কেন হ'লি বাবা! কি হয়েছে তোর,

বল্‌না, আমাকে বল্‌না! আমি ত তোর মা। আজ শ্যামাদিদি এসেছিল, সে ব'ল্‌ছিল, বোসেদের বাড়ী একটি বেশ টুক্‌টুকে মেয়ে আছে, বয়সও অল্প, যেন ঠাকরুণটি! তোর সঙ্গে তারা বিয়ে দিতে চায়, তারা কিন্তু তোকে ঘরজামাই রাখ্‌বে, তাদের ত ছেলে-পুলে নেই। তা বাবা, তুই সুখে থাকলেই আমি সুখী। তোর সংসার পাতিয়ে দিয়ে আমি বৃন্দাবনে চ'লে যাব। নাতীর মুখ দেখা কি আমার পোড়াকপালে ঘট্‌বে! তা বাবা, কা'ল সকালে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আস্‌বি? তুই লেখাপড়া শিখেছিস্‌, নিজে দেখে শুনে বিয়ে কর্‌। তোর আর কে আছে বল্‌! আমার পোড়া অদেষ্ট, আজ তিনি থাক্‌লে এ সব কথা কি তোকে ব'ল্‌তে হত?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চর্ম্মসার শুষ্কগণ্ড বাহিয়া শরতের শেফালীবর্ণের ন্যায় দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। রসময়ও কাঁদিয়া ফেলিল। মায়ের কাছে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রসময় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিল না। কিন্তু তখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া নিজের শোক সাম্‌লাইলেন। এমন করিয়া রসময় মায়ের কাছে ত কখন কাঁদে নাই। রসময়ের কেবল ত পিতৃশোক নয়, এ যে প্রয়াগের নদীপ্রবাহ—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তিনের সম্মিলিত স্রোত! পিতৃভক্তি, মাতৃ-স্নেহ, আর যুবতীর প্রেম,—এই তিনের ঘাতপ্রতিঘাতে রসময়ের হৃদয়ে এক বিরাট্‌ ভাবপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। সহ্য করিতে না পারিয়া রসময় নয়নপথে সেই প্রবাহের মুখ খুলিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধা পুত্রের এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত, চমকিত এবং আতঙ্কিত হইলেন।

(৬)

বৈশাখমাস; কলিকাতার রাজপথে যেমন ধূলি, তেম্নি রৌদ্র। সূর্য্যের খরতাপে সব শুষ্ক ও কঠিন। প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপথের ধূলি আকাশে উঠিয়াছে, পথ কঠিন ও বন্ধুর হইয়াছে। গাড়ি-ঘোড়া কেমন যেন কঠিন খড়্‌খড়্‌ মড়্‌মড়্‌ শব্দ করিয়া পথের বন্ধুরতা ও আকাশের শুষ্কতা জানাইয়া যাইতেছে। আকাশের তাম্রবর্ণ, ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া, কিঞ্চিৎ ধূসরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব উত্তপ্ত তাম্রগোলকের ন্যায় একটু যেন লোহিতাভ। খরদীধিতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, কিন্তু উহার অনুভূতির ক্লেশ অসহ্য হইয়াছে। পৌষের সূর্য্যের ন্যায় নিদাঘ-তপনও যেন কুজ্ঝটিকাবৃত, ম্লান ও হীন-জ্যোতি। পরন্তু পৌষের সূর্য্যে উত্তাপ নাই, বৈশাখের সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপ। পৌষের রৌদ্রে স্নেহগুণ আছে, বৈশাখের রৌদ্র কেবল শুষ্ক। পৌষের সূর্য্য মনুষ্যের সেব্য, বৈশাখের সূর্য্য জীবমাত্রেরই পরিত্যাজ্য। পৌষের সূর্য্যতাপে উৎফুল্লতা আছে, বৈশাখের সূর্য্য-তাপে কেবল অবসাদ,—নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেও কষ্টবোধ হয়। অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে দুই সূর্য্যই এক।

ট্রামের ঘোড়াগুলার জিভ্‌ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর চলিতে পারিতেছে না। ছক্কড়ের ঘোড়ার তেমন জিভ্‌ নাই, বাহির হইবে কি!—সতেজ শোণিত-প্রবাহ নাই, অবসাদ হইবে কিসে! তাই ট্রামগাড়ি চলিতেছে না, ছক্কড় চলিতেছে। আর ছক্কড়ের দারুক-সারথি কঞ্চিতে বাঁধা একগাছি দড়ি ঘুরাইয়া হিঃ—হিঃ করিতেছেন—শীতে কি গ্রীষ্মে, তাহা বুঝা যায় না, কারণ কলিকাতায় অশ্বিনীকুমারযুগলের চালকের

পরিচ্ছদ বারমাসই সমান। বারমাসই তাহারা হিঃ হিঃ করিয়া থাকে। সুতরাং নিদাঘ স্থির করা কঠিন।

এমনি একখানি অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিয়া এক বাবু শোভাবাজারের দিকে যাইতেছেন। বাবুর মাথায় বাঁকা তেড়ী, তেড়ীর দুই পার্শ্বে বীচিবল্লরীচুম্বিত তরঙ্গায়িত বালুকাভূমীর ন্যায় কেশদাম। নদীকূলেব বালুকাময়ী তরঙ্গায়িত তটভূমিতে যেমন অপচীয়মান ফেনরাশি পড়িয়া থাকিয়া বালুকার স্বচ্ছ শ্যামকান্তিকে ধূলিধূসরবর্ণে পরিণত করে, তেমনই পথের রজো-রাশি বাবুশীর্ষের তরঙ্গায়িত মসৃণ শ্যামদামের উপর পতিত থাকিয়া কেশগুচ্ছসমূহের সমুজ্জ্বল আভাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। রাজরথ্যার রজোরাশি বাবুর মাথায় উড়িয়া পড়িয়া নিরস্ত থাকে নাই; পদ্মরাগের ন্যায় ভ্রূর উপর ন্যস্ত আছে, চম্পকচূর্ণের ন্যায় নয়নপল্লবে দুলিতেছে; আর ক্বচিৎ কপোল-সংলিপ্ত, ক্বচিৎ চিবুকবিলম্বী লতায়মান ফ্রেঞ্চ-ফ্যাসানের দাড়ির উপর পড়িয়া শ্রাবণের কদম্বকেশরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বাবুর দেহযষ্টি রক্ষা করিতেছে একটি ইভ্‌নিং ড্রেসের উপযোগী সার্ট; পেণ্টলানে আঁটিবার টাইহোলযুক্ত ইস্তিরী-করা বস্ত্রখণ্ড সার্টের প্লেটের নীচে বককুসুমের ন্যায় বক্রভাবে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শোভা পাইতেছে। সার্টের উপর একখানি ফিরোজা-রঙের জাপানী রেশমের চাদর; চাদরখানি চাদরের মত দেহের উপর বিলম্বমান নহে, কতকটা ওড়নার ঢং, কতকটা পিতৃ-দায়গ্রস্ত ভাগ্যহীন পুত্রের কাচার ঢঙে বিন্যস্ত। বাবুর কটিতট হইতে বিনামার বেলাভূমি পর্য্যন্ত এক অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড বাঙ্গালার চিরন্তনপ্রথানুসারে কতকটা লজ্জানিবারণের উদ্দেশ্যে,

কতক বা পুলিশের অশ্লীলতা-নিবারক আইনের খাতিরে বিজড়িত, বিলম্বমান ও লুটায়িত। কাপড়ের পাড় সবুজ রেশমের। সর্ব্বনাশ! পায়ে আবার মোজা! সে মোজাযুগল আবার হাঁটুর সানুদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; লজ্জায় বোধ হয়, আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিশেষ গার্টারনামক বন্ধন-রজ্জু তাহাদের উর্দ্ধগতিকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পায়ে কোর্ট্ শু। দুই করের দুই অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে দুইটি দুইটি চারিটি অঙ্গুরীয়। সব্যেতর করে রক্তবর্ণের একখানি রেশমী রুমাল। আর মুখে,—ও কি ও—মুখে আগুন কেন? ওহো চুরুট! তাপে পাষাণ ফাটিতেছে, তাপে ঘোড়া হাঁপাইতেছে, তাপে কিন্তু বাবু ঠিক আছেন; তাপসামঞ্জস্য করিবার জন্যই যেন চুরুটের বহ্নিবিন্দু ওষ্ঠাধরের মধ্যপথে। কিন্তু তাহা ভস্মাচ্ছাদিত, বোধ হয়, শ্রীমুখসান্নিধ্যবশতঃ। সব কথা বলিলাম, বাবুর গোঁফের কথা ত বলি নাই! করমচার কাঁটা দেখিয়াছ? মাঝখানে পাকা টুক্‌টুকে করমচাটি দুলিতেছে, আর দুই পার্শ্বে দুইটি কাঁটা খাড়া হইয়া আছে। বাবুর গোঁফও ঠিক তাই! প্রথম বর্ষার প্রাচীরগাত্রের শৈবালের মত ওষ্ঠের উপর কেমন-যেন কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হইতেছে বটে, কিন্তু শষ্পস্তম্ববিস্তারের ন্যায় গুম্ফস্তম্বসকল লুটাইয়া লতাইয়া যায় নাই। দুই পার্শ্বের কয়েকগাছি সাহসভরে একটু অধিক গজাইয়া উঠিতেছে। ইহাদের উপর বিলাতী ওয়াক্সের কারিগরী আছে; কাজেই ঠিক করমচার কাঁটা—সরল, সটান, সুতীক্ষ্ণ।

এ হেন বাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা মালতীর বাসভবনের সম্মুখে আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পদ্মার ইল্‌সে-ডিঙি পা'লভরে তুলিতে দেখিয়াছ? যদি তাহা দেখিয়া থাক,

তাহা হইলে বাবুর মাতঙ্গগমনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। বাবু একখানি ইল্‌সে-ডিঙির মত দুই পার্শ্বেই হেলিতে দুলিতে হেলিতে দুলিতে আবদ্ধ কবাটের উপর পড়িয়া কেবল আঘাত করিতে লাগিলেন। সে আঘাতে কিছুই হইল না, এইবার কড়ানাড়ার পালা। সে পালাও শেষ হইল,—উত্তর নাই। শেষ ডাকহাঁক—"ও শঙ্করি, ও শঙ্করি—ও শাঁকুমণি, ও শঙ্খবাসিনি" প্রভৃতি কত আদরের বোল্ হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরিত, প্লুত প্রভৃতি নানাস্বরে উচ্চারিত হইল। শেষে ভিতর হইতে কেমন-একটা শব্দ শুনা গেল। বলদ একটু গাঝাড়া দিলে ঘানিগাছ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রব করে, সে ভাষা—সে সুর জান কি? ঠিক তেমনি "বাবু—কেঁ—ওঁ" শব্দ হইল। বাবু বলিলেন, "ওগো, আমি ঘনু, দোর খোল।" দ্বার খুলিল; মালতীর মাতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী শ্রীমতী শঙ্করী দাসী একেবারে সশরীরে বিরাজমানা।

বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন, শঙ্করী দরজা বন্ধ করিল।

বৈশাখের যে রৌদ্র, যে উত্তাপ, তাহাই বজায় রহিল। তখন বৈশাখের রুদ্রভাব-স্পষ্টীকরণ-মানসে যেন সেই ছক্কড় গাড়িখানি কুর্ব্বঞ্ঝনৎকার চলংষ্টিট্রভের ন্যায় নানাবিধ বৈয়াকরণ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এইবার শঙ্করী দাসীর পরিচয়টা দিব! দেহের পরিচয়ের প্রয়োজন আছে কি? রমণীমাত্রেই কুন্তীর আদর্শে প্রতিপালিতা, রমণীমাত্রেই চিরযুবতী—স্থিরযৌবনা। সুতরাং শঙ্করীকে বর্ষীয়সী বলা ভাল হয় নাই। কিন্তু শঙ্করী যে এখন মালতীর কর্ত্রী, মালতীর মাতা, কাজেই কারে পড়িয়া তাহাকে বুড়ী সাজিতে হইয়াছে। কারে পড়িয়া অনেক "উপ" ও ভাল-মন্দ

হয়, আমাদের শঙ্করীর ভাল-মন্দ হইবে না! শঙ্করী বর্ষীয়সী হইলেও, তাহার বয়স যায় নাই। কারণ সে ত এখনও মরে নাই—বয়স শেষ হইলেই যে মরিতে হয়! শঙ্করীর রূপ কেমন বলিব? হিসাব করিয়া বল দেখি, তোমাদের বাড়ীতে কয়টা ঝী এতকাল আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে? ক্ষেমীর মা, গোব্‌রার মামী, পদীর পিসী, হাব্‌লার মাসী, রামী, বামী, সৈরভী, মুক্তি, তারী, নেড়ী—ইত্যাকার যত ঝী শ্রীপাঠ মেদিনীপুর হইতে শুভাগমন করিয়া খাঁটি কায়েস্ত সাজিয়া তোমার অঙ্গন পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চেহারাগুলি মনে আছে ত? ক্ষেমীর মার কেমন কপাল! ঠিক যেন রত্নাকর প্রচ্ছন্নকারী বল্মীকস্তূপ! গোব্‌রার মামীর কেমন চক্ষু দুইটি! যেমন ডালহারাদের জাঁতা—কেবলই ঘুরিতেছে, কেবলই অপাঙ্গভঙ্গীতে মানুষ মজাইতেছে! পদীর পিসীর কেমন নাক! মেছো কুমীর যখন ডুব মারে, তাহার পূর্ব্বে তাহার ল্যাজটা যেমন ধূমকেতুর ছটার ন্যায় বাঁকিয়া ঘুরিয়া ডুবিয়া যায়—ঠিক তেমনি; অতি বন্ধুর, ঠিক যেন চিরুণীর দাঁতের মত; অতি বড়, ওষ্ঠের উপর ঠিক যেন মেছো কুমীরের ল্যাজের আগাটি, আর নয়নযুগলের সঙ্গমস্থলে একেবারেই নাই, সেখানে মৎস্যভুক্ কুম্ভীর একেবারেই ডুব মারিয়াছে। বাধা নাই দেখিয়া নয়নযুগল উভয়ে উভয়কে কেবল দেখিতেছে—লক্ষ্মীট্যারা! হাব্‌লার মাসীর কেমন ঠোঁট দুইটি! পুরাতন পুষ্করিণীর বজবজান্বিত পাঁকের উপর যেন দুইটি বিরাট্ জলৌকা!

এমনি করিয়া তিল তিল করিয়া ঝী কুলের সৌন্দর্য্য আহরণ কর; যদি অভাব পড়ে, তবে রাজনগরের বড়রাস্তার দুই পার্শ্বে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া যাইও, অভাব থাকিবে না। তাহা

হইলে শ্রীমতী শঙ্করীর দেহলতিকার সৃষ্টিচাতুরী ও লাবণ্যভাতি উপলব্ধি করিতে পারিবে। শঙ্করী একখানি নয়হাতী কাপড় পড়িয়াছিল। কার্পাস ত কোমল!—হউক না কেন, তাহার ভাগ্যে চর্কার কুম্ভীপাক; হউক না কেন, তাহার টানা-পড়েনের বিড়ম্বনা; হউক না কেন, সে সপ্তাহে সপ্তাহে ধোপার পাটে আছাড়িত; তথাপি তাহার ত মর্য্যাদাবোধ যায় নাই। নয়হাতী ধুতি অনেক কষ্টে তাহার পাড়রূপ নয়ন মুদিত করিয়া শঙ্করীর কটিতট বেষ্টন করিয়াছিল, নাভিসরোবর এড়াইয়া বক্ষস্থলেও গিয়া পঁহুছিয়াছিল; শেষে কম্বু কণ্ঠ পরিক্রমণ-কালে হতভাগ্য ধুতি শঙ্করীর বদনভাতি একনজর দেখিয়া লইয়াছিল! আর পারিল না;—অল্প প্রাণে কত সহ্য করিবে! ধুতি লজ্জায় মরমে মরিয়া খোঁপার কাছে গিয়াই মুখ লুকাইয়াছিল। হায় রূপ!

এই সুন্দরী আমাদের সুন্দর বাবুটিকে লইয়া দ্বিতলে উঠিল না। নীচের একটা ঘরে গিয়া বসিল। বাবু হস্তপদ—পদ কেন বলি, সে যে মোজা-আঁটা—হস্তমুখ প্রক্ষালন না করিয়াই সেই অপূর্ব্ব রূপেই তক্তাপোষের মাজুরীর উপর গিয়া বসিলেন। শঙ্করী বাবুর হাতে একটি করতাপ-কদুষ্ণ তাম্বূল দিয়া বলিল,—"কি যদুবাবু! এই দু'পর রোদ্দুরে কি মনে কোরে?"

বাবু। মালতী মালতী মালতী ফুল;
মজালে মজালে মজালে কুল।

আর কি ভাই! যে জ্বালায় জ্বল্‌ছি, সেই জ্বালা জুড়ুতে এলুম।

শঙ্ক। জ্বালা জুড়ুবার পূর্ব্বে প্রলেপের দাম কত দেবেন? সেটা ঠিক ক'রেছেন? পার্‌বেন ত?

বাবু। বলিছি ত, ঘর সাজাবার খরচ বাবদে, আর পোষাক

কাপড় ও গহনা বাবদে একেবারে দু'হাজার টাকা দেব; মাসে মাসে মাসোহারা হিসাবে এক-শ টাকার বেশী দিতে পার্‌বো না। তবে চাকর-চাকরাণী, দরোয়ান-বামুন, ডাক্তার ও ওষুধের খরচ আলগ্‌ দেব। এতে হবে না?

শঙ্ক। হবে, কিন্তু মাসোহারা আরও একটু বাড়াতে হবে; দেড়-শ টাকার কমে হবে না! আর, আমাকে কি দেবেন?

বাবু। দশটা মোহর একসঙ্গে পায়ের কাছে রেখে প্রণাম ক'র্‌বো। মালতীকে আমার চাই। নইলে আমি ম'রে যাবো। আমি এখন যা পারি, তা ব'লেছি, এর অধিক দিতে পার্‌বো না। আসল কথা, মালতীকে আগে সোজা করো!

শঙ্ক। ও দোষ শীগ্‌গিরিই চ'লে যাবে। ছুড়্‌কো দোষ কি বয়স পাক্‌লে থাকে? মালতীর এই ষেটের কোলে পনের বছর বয়স বই ত নয়! তুমি ছোক্‌রা কি একটু পোষ মানাতে পারবে না?

বাবু। বাহবা, এত পয়সা দেব, আবার পোষও মানাতে হবে! ঘরের বৌ কি দোষ ক'র্‌লে! সে একটু বেতর লাজুক; কাছে যখন আসে, তখন মনে হয়, ঠিক যেন একটা কাপড়ের পুঁটুলি আস্‌ছে। রাত্রি বারোটার পূর্ব্বে ত দেখাই হয় না;— দেখা হ'লে ত তার এত লজ্জা যে, কথা কওয়া দায় হয়! পাছে কেউ কথা শুন্‌তে পায়, পাছে কেউ জান্‌তে পারে, কোনে-বৌ ঘরে আছে,—এই ভাবনাতেই সে অস্থির! ও সব সহ্য হয় না। বিশেষ মালতী আমার চোখে প'ড়েছে! মালতীকে আমার চাই; চাই ব'লে যে আমাকে কুক-সাহেবের আড়গড়ার জকীদের মত তাকে ব্রেক ক'রে নিতে হবে, তা আমি পার্‌বো না। জান,

ব্রেক-করা ঘোঁড়া ও কোরা ঘোঁড়ায় দামের কত তফাৎ? দাম কমাও, আমিও সে ভার নিচ্চি।

শঙ্ক। কমে যমে হবে না। এ চাঁদনীর দোকান নয় যে, কেবল দর দস্তর ক'র্‌বে! তুমি টাট্‌কা সামগ্রী পাচ্ছ, এ মানটা কত বড় বল দেখি? তুমি এ বয়সে দর দস্তর ক'র্‌বে, ত পাক্‌লে না জানি কি হবে! বয়স আঠারো উনিশের বেশী ত নয়। এই ত সে দিন তোমার বাপ মরেছে!

বাবু। মালতী আমার চোখে লেগেছে, মালতীকে আমার চাই। দিনকয়েক আমাদের বরানগরের বাগানে রাখ্‌লে হয় না? একেবারে ঢিট্‌ হয়ে যাবে। কি বল?

শঙ্ক। আপত্তি নেই, কিন্তু আমায় আরও কিছু বেশী দিতে হবে। মালতীর মাসোহারাটা মাসের শেষে আমারই হাতে দিতে হবে। এখন কোন কথা ভেঙে কাজ নেই, মালতীকে ভুলিয়ে বাগানে নিয়ে যাও, সেখানে যা হয় হবে, আর সেই ছোঁড়াটাও কোন খোঁজ খবর পাবে না। বেশ পরামর্শ!

বাবু। কোন্‌ ছোঁড়া?

শঙ্ক। আরে বাবু, সে মজার কথা। সেই গেরণের দিন আমরা মায়ে ঝিয়ে গঙ্গা নাইতে যাই। ভিড়ে মালতী হারিয়ে গেল, আমি ত ভেবে খুন। গেরণ ছাড়লে আমি উপরে উঠে দেখি, ছুঁড়ি একটা ছোঁড়াকে পাক্‌ড়া ক'রেছে; আর কিছু না ব'লে, সাঁ ক'রে বাড়ি চ'লে এলেম। ওদের কাউকে জান্‌তেও দিলেম না। মা গঙ্গাকে হাজার হাজার প্রণাম ক'ত্তে ক'ত্তে এলেম, আর ব'ল্‌তে লাগ্‌লেম, 'হে মা গঙ্গা, মালতীর আমার সুমতি দেও, সে যেন ঘর-সংসার ক'ত্তে পারে, তার যেন ভাল

বাবু জোটে! তা জুট্‌লও বটে,—পোড়াকপাল আর কি!—সে একটা জলপানি-খেকো কালেজের ছোঁড়া! ওই রসময় ছোঁড়াটা! আমি সেদিন তাকে না চিন্‌তে পেরে কতই আদর ক'রেছিলেম। পরে বুঝেছি যে, সব ভূয়ো। তবে মালতী ছুঁড়ি একটু পাল্লায় প'ড়েছে;—এই যা ভাবনা। তা তোমার কাছে থাক্‌লে সব শুদ্‌রে যাবে।

বাবু। গতিক বড় সোজা নয়, এর মধ্যে আবার পিরীত আছে! দেখা যাক্, শেষে কি দাঁড়ায়! চল, উপরে চল।

শঙ্ক। টাকা নিয়ে এয়েছ ত?—টাকা আগে চাই। মালতী আমার কাঁচা মেয়ে, টাকা না নিয়ে আর আমি কোন পুরুষকে তার কাছে এগুতে দিচ্ছি নে। টাকা দাও।

বাবু। তোমার প্রণামী তুমি নেও, এক মাসের মাহিনে আগু-য়ান নেও, ঘর সাজাবার আর গহনা ও কাপড় কেন্‌বার টাকার অর্দ্ধেক এখন নেও। যেমন যেমন ঘর সাজান হবে, তেমনি তেমনি টাকা পরে দেব। কিন্তু আগে একবার মালতীকে নেড়ে-চেড়ে দেখি। সে যদি মেনীবিড়ালের মত ফ্যাচ্ করে, তবেই ত গেছি বাবা!

শঙ্করী ঠাকুরাণী দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া নোট কয়খানি গণিয়া লইলেন। বাবু ইত্যবসরে হাতমুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইলেন, কিঞ্চিৎ সুরাপান করিয়া তৈয়ার হইয়া শঙ্করীর সহিত উপরে উঠিলেন।

মধ্যাহ্নের মাথার উপরের সূর্য্য একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছেন। মালতীর কক্ষের ভিতর বৈশাখের রৌদ্র আসিতেছে। মালতীর সংজ্ঞা নাই। একখানি ইন্‌ভ্যালিডের কোচে মালতী শুইয়া

আছে। নয়ন দুইটি মুদিত; মাথার নীচে বালিশের মত করিয়া দক্ষিণ হস্ত ন্যস্ত, বাম কর কণ্ঠের নীচে হৃদয়ের উপর স্থাপিত। আর কপোলযুগল শিশিরস্নিগ্ধ কদলীপত্রের মত,—অঙ্গুলি-স্পর্শেই বুঝা যায় যে, ঘর্ম্মাক্ত। আজ একমাস কাল রসময়ের সহিত সাক্ষাৎ নাই। মালতী ভাবিয়া ভাবিয়া হেমন্তের ম্রিয়মাণা মৃণালীর ন্যায় দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছে, যেন যৌবনের লাবণ্য-রাগের উপর চিন্তার কালিমা পড়িয়া কোমল কমলপল্লবের ন্যায় কপোলযুগলকে কুঞ্চিত করিয়া দিয়াছে।

মালতী শুইয়া আছে, এমন সময়ে শঙ্করী আসিয়া ডাকিল, "মা মালতি! উঠ মা; বেলা যে গেল!" শঙ্করীর ডাকে যেন স্নেহের শেফালিধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। মালতী চমকিয়া উঠিয়া বসিল। মায়ের আজ্ঞা-মত মুখ-হাত-পা ধুইয়া আসিয়া বসিল। শঙ্করী আবার ঝঙ্কার দিল,—"মালতি, রসময়-বাবুর এক বন্ধু এসেছেন; তাঁর মার অবস্থা বড় মন্দ। বুড়ীকে বরানগরের গঙ্গাতীরে এক বাগানে রাখা হয়েছে। রসময়বাবু সেখানে আছেন। যে বাবুটি এসেছেন, বাগান তাঁরই। রসময়বাবুর বড়ই ইচ্ছে, তুমি এই নূতন বাবুর সঙ্গে একবারে বরানগরের বাগানে যাও। যাবে কি? সন্ধ্যার পর আবার ফিরে এসো এখন। সঙ্গে কি ঝি দেব?" মালতী ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "কোনও চিঠি আছে কি? আমি একলা কেমন কোরে যাবো? তুমি চলোনা?"

শঙ্করী একগাল হাসিয়া বলিল "বেশ, তাই হবে, আমিই যাবো। তুমি গা ধুয়ে নাও।"

মালতী গা ধুইতে গেল। সেই অবসরে শঙ্করী আসিয়া ঘনুবাবুকে নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও চতুরতার পরিচয় দিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকেও কপটতার ও মিথ্যার সকল আগম নিগম বলিয়া দিল।

বালক মেঘনাদ হাসিয়া আকুল। নরকের পিচ্ছিল ঢালু পথে সে আর কখনও চলে নাই। এই তাহার প্রথম গতি। সে এখন কেবল গড়ানে পথের সুখ অনুভব করিতে লাগিল। মেঘনাদ বসু বড় বাপের ব্যাটা। তাহার পিতা একজন বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার ছিল;—বিদ্যাবুদ্ধিতে বিখ্যাত, ঘুষ লইতেও সুপটু। বুড়া যখন মরে, তখন তাহার জমিদারী-সম্পত্তির বার্ষিক আয় লাখ্ টাকা, নগদ ও কোম্পানীর কাগজে মোট মজুদ পাঁচলক্ষ টাকা, কলিকাতায় পাঁচখানি বড় ভাড়াটিয়া বাড়ী ও নিজেদের বসত বাটী এবং বসনভূষণ, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি বড়মানুষী আসবাব ছিল। মেঘনাদ এক পুত্র,—তাহার পিতার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত এক পুত্র। মেঘনাদের বৈমাত্রেয় ভগিনী সাতটি। সুতরাং মেঘনাদের বড়ই আদর। সেই মেঘনাদ আজ মালতীর দ্বারে ভিখারী! মেঘনাদ হাসিবে না?

ইত্যবসরে শঙ্করী মালতীকে সাজাইবার জন্য উপরে গেল, ভাল ভাল কাপড় ও জামা বাহির করিয়া তাহাকে পরিতে বলিল। মালতী উত্তর করিল, "ছিঃ মা, যার বুড়ো মা ম'র্‌ছে, তার কাছে কি এমন সেজেগুজে যেতে হয়?" বলিতে বলিতে মালতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল! মালতী মনে মনে ভাবিল, "বিধাতা কেন এমন ক'ল্লেন? তাঁর মাতৃসেবা করিবার অধিকার ত আমার! আমি এখন কোথায়? তিনি না জানি কত কষ্ট

পাচ্ছেন!" টপ্‌টপ্ করিয়া চোখের জল মালতীর বুকের উপর পড়িতে লাগিল।

শঙ্করী একটু যেন বিরক্তির ছলে, অথচ বড়ই আদর দেখাইয়া বলিল, "ছিঃ, পাগলী আর কি? কোথায় কি, তার ঠিক নেই, এখনই কান্না! আগে চল্, গিয়ে দেখ্, পরে যত পারিস্ কাঁদিস্। এখনই অমঙ্গল গাইলে অমঙ্গলই যে হবে। যাবার সময়ে মা সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে যাস্।"

ঘনুবাবুর আর বিলম্ব সহে না। যে মালতীর মুখ বাতায়ন-পথে একদিন দেখিয়া ঘনুবাবু পাগল হইয়াছেন, সেই মালতী আজ তাঁহার সঙ্গে একগাড়িতে যাইবে। যে মালতীর জন্য তিনি অতগুলা টাকা গণিয়া দিলেন, সেই মালতী আজ তাঁহার সঙ্গে একগাড়িতে যাইবে। আর কোনও স্বর্গ আছে কি? ঘনুবাবু আর পারিলেন না, নীচে হইতে সাড়া দিয়া বলিলেন, "গাড়ি এসেছে, সব প্রস্তুত।"

শঙ্করী উত্তর করিল—"যাচ্ছি বাবু, একটু দাঁড়ান।"

কিছুক্ষণ পরে শঙ্করী মালতীর হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া আসিল। মালতী ঠিক যেন কলা-বৌটির মত জড়সড় হইয়া মায়ের অনুগমন করিতেছিল। মালতীরও মনে সুখ ছিল—কতদিন পরে রসময়কে সে আবার দেখিতে পাইবে;—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই বিশাল বক্ষ, সেই সুগোল বাহুদ্বয়, সে আবার দেখিতে পাইবে। তাহার মুখের কথা শুনিতে পাইবে। মার যদি গঙ্গালাভ হইয়া থাকে, তবে রসময়ের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেও একটু কাঁদিবে—না, না, খুব কাঁদিবে, বুক ফাটাইয়া কাঁদিবে। সুখে বিভোর হইয়া মালতী ভাবিল,

"হায় বিধাতা, আমি কেন বেশ্যার কন্যা হইলাম! নহিলে আজ আমি তাঁর সব! অশৌচে অশৌচ গ্রহণ করিতাম, উপবাসে উপবাস করিতাম, চিন্তায় সে চিন্তার অংশভাগিনী হইতাম। এখন আমার দখল কেবল ক্রন্দন। হা বিধিলিপি!" এ সব ভাবিয়াও মালতী সুখী, কেন না, মালতী যে রসময়ের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে!

"উঠুন, গাড়ি সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।" মেঘনাদ এই কথা বলিয়া মালতীর হাত ধরিয়া গাড়িতে তাহাকে তুলিয়া দিতে চাহিল। মালতী সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। শঙ্করী তাড়াতাড়ি তাহাকে গাড়িতে উঠাইল।

একি এ—মালতীর দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইল কেন? মালতী কাঁপিয়া উঠিল কেন? হরি—হরি, কেন এমন হয়! তবুও মালতী আশায় বুক বাঁধিয়া স্থির হইল। যিনি সকলের দেবতা, যিনি করুণানিধান, মালতী তাঁহাকে মনে করিল। মালতী সাহস পাইল, আর মনে করিল, তাহার দেবতা রসময়কে;—সেই মুখখানি যেন শতচন্দ্রকিরণমধ্যস্থ হইয়া মালতীর হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠিল। মালতী বল পাইল। গাড়ি চলিল।

এইবার মালতীর পরিচয় একটু দিব। মালতীকে ঠিক বেশ্যা-কন্যা বলা যায় না; কারণ মালতীর মাতা বেশ্যাবৃত্তি করিত না। দিগম্বর দত্ত সদর-দেওয়ানী আদালতের একজন বিখ্যাত মোক্তার ছিলেন। যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া পুত্রকন্যাকে সচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র নীলাম্বর দত্ত পরে হাইকোর্টের উকীল হইয়াছিলেন, তাঁহারও লক্ষ্মীভাগ্য খুব ছিল। নীলাম্বর দত্ত রাজসাহীতে মকদ্দমা করিতে

যাইয়া মালতীর গর্ভধারিণীকে দেখিতে পান। মালতীর মা গৃহস্থ-কন্যা ও বিধবা; নীলাম্বর যে বাসায় ছিলেন, সেই বাসার পার্শ্বেই মালতীর মায়ের বাড়ী ছিল। নীলাম্বর মকদ্দমা করিতে যাইয়া যথেষ্ট অর্থও পাইলেন, মালতীর মাকেও লাভ করিলেন। উভয়ে কলিকাতায় [illegible]লেন; নীলাম্বর মালতীর মায়ের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

মালতীর মায়ের নাম সরস্বতী। তিনি রূপেও সরস্বতী, গুণেও সরস্বতী। সরস্বতী বালবিধবা ছিল, বাপের আদুরে মেয়েও ছিল। সরস্বতী বাপের আদরে থাকিয়া বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল; বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত,—মন্দ জানিত না। সরস্বতীর যখন পূর্ণযৌবন, তখন বাঙ্গালায় বিধবাবিবাহের বিষম হুজুগ উঠিয়াছিল। একদিকে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় আলোচনা ও আন্দোলন, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজের তাড়না ও গঞ্জনা। বিধবাবিবাহের আইন পাশ হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজব্যয়ে অনেকগুলি বালবিধবার সদ্গতি করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজেও বিধবাবিবাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এতই জোর হুজুক যে, তখন মনে হইত, বুঝি আর কেহ কুমারীবিবাহ করিবে না, সকলেই কেবল বিধবাবিবাহ করিবে। তখন শিক্ষিত বাবু-সমাজে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে কোন কথা কহিলে মা'র খাইতে হইত। এই সময়ে সরস্বতী নীলাম্বরকে দেখিল। সরস্বতী খবরের কাগজ পড়ে; নীলাম্বর হাইকোর্টের উকীল, ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যাইয়া চক্ষু বুজিয়াও থাকেন। নীলাম্বর সরস্বতীকে দেখিয়া কাঁদিলেন,—দেশের ভাবনা ভাবিয়া কাঁদিলেন, সরস্বতীর ভাবনা ভাবিয়া কাঁদিলেন, সমাজকে গালি দিলেন, বাঙ্গালী

জাতিকে সাগরগর্ভে ডুবাইবার জন্য ভগবানের উপাসনা করিলেন। সরস্বতীও যুবক নীলাম্বরকে দেখিল,—দেখিয়া কাঁদিল, নিজের জন্য কাঁদিল, নীলাম্বরের জন্য কাঁদিল, বাঙ্গালার অবরোধে অবরুদ্ধ এবং সকল সুখে বঞ্চিত নারীজাতির জন্য কাঁদিল, আর সেকালের গোঁড়া পুরুষগুলাকে গালি দিতে দিতে কাঁদিতে লাগিল। কান্নাকাটির পর উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

নীলাম্বরের স্ত্রীপুত্রও ছিল, ঘরসংসারও ছিল। কিন্তু নীলাম্বর সরস্বতীকে আনিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। প্রথম পাখী —বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ, কারণ তিনি এই কর্ম্ম করিয়া সমাজ-সংস্কারক হইলেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে একজন মণ্ডল হইলেন। দ্বিতীয় পাখী—তাঁহার প্রবৃত্তি, তাঁহার বিলাস-বাসনা। অপরূপ রূপবতী ও বিদ্যাবতী সরস্বতীকে পাইয়া নীলাম্বর মনুষ্যজন্মের অনেক সাধবাসনা মিটাইতে পারিলেন; সরস্বতী রক্ষিতা বেশ্যাও নহেন, অথচ সনাতন-সমাজ-সম্মানিত ভার্য্যাও নহেন; সরস্বতীর ভবনে নীলাম্বর বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ-আহ্লাদও করিতে পারিতেন। অথচ সরস্বতী তাঁহাকে ভাল বাসিত, তিনিও সরস্বতীকে ভাল বাসিতেন। মালতী সরস্বতীর গর্ভজাতা কন্যা। সরস্বতী, কন্যা মালতীকে অতি সাবধানে লেখাপড়া ও গীতবাদ্য শিখাইয়াছিলেন। বড় সাধ ছিল, মালতীকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে নীলাম্বরের মৃত্যু হইল। সরস্বতীর আর্থিক অবস্থা বড়ই মন্দ হইল। কষ্টে আরও তিন বৎসর তিনি কন্যা মালতীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। মালতীর যখন চৌদ্দবৎসর বয়স, তখন ভীষণ বসন্তরোগে সরস্বতীর মৃত্যু হইল। মালতী সংসারে একা হইয়া পড়িল।

শঙ্করী দাসী সরস্বতীর সঙ্গিনী ছিল; রাজসাহী হইতেই শঙ্করী সরস্বতীর সঙ্গে আসিয়াছিল। শঙ্করীকে সর্ব্বস্ব দিয়া সরস্বতীর বিশ্বাস হইত। শঙ্করীও খুব হিসাবী মেয়েমানুষ ছিল। তাহার ব্যবস্থার গুণে সরস্বতীর দুর্দ্দিনে কখনও কোন অভাব ঘটে নাই। সরস্বতী চলিয়া গেল; মালতী শঙ্করীর ঘাড়ে পড়িল। শঙ্করী মালতীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু শঙ্করীর ইচ্ছা ছিল যে, মালতী বিবাহ না করিয়া কোন ধনী বাবুর রক্ষিতার স্বরূপ থাকে; তাহা হইলে শঙ্করীরও দুঃখ ঘুচিবে, মালতীও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে; রূপযৌবন থাকিতে থাকিতে এই ব্যবস্থাটি হইয়া যাইলে শঙ্করী নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

মালতী কিন্তু কিছুতেই বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে রাজী হয় নাই। সে জানিত, বেশ্যার অবস্থা কি ভীষণ, সে বুঝিত, বেশ্যা হইলে আর নিস্তার নাই। যে রূপ ভগবানের ছায়ার স্বরূপ, যে রূপ স্ত্রীলোকের লক্ষণ,—সে রূপ বেচিয়া মালতী সুখী হইতে পারে না। মালতীর শিক্ষাদীক্ষা যে স্বতন্ত্র! মালতী যে গৃহস্থের কন্যার ন্যায় প্রতিপালিতা! মায়ের কাছে মালতী রামায়ণ মহাভারত পড়িয়াছে, ধর্ম্মকথা শুনিয়াছে; মালতী পবিত্রচিত্ত ও সরলবিশ্বাসী। মায়ের জীবনের সকল কথা মালতী জানিত, রক্ষিতার সুখদুঃখ সব বুঝিয়াছিল। মালতীর মা অমন রূপবতী গুণবতী হইয়াও,—নীলাম্বরগতপ্রাণা হইয়াও, পত্নীর মর্য্যাদায় মর্য্যাদাপন্ন হইতে পারেন নাই। মালতী এইটুকু কখনই ভুলিতে পারে নাই। পিতৃপরিচয় দিতে মালতী সদাই সঙ্কুচিত হইত, পিতার নামোল্লেখ হইলেই মালতী কাঁদিয়া ফেলিত। শঙ্করীর যতই আদর-যত্ন ও অন্য নানাবিধ চাতুরী থাকুক না কেন, মালতীকে

সে কিছুতেই মনের মতন করিতে পারে নাই। শেষে স্থির করিয়াছিল, একটু বয়স বাড়িলেই মালতী আপনা-আপনি সায়েস্তা হইবে। যে দিন রসময়কে লইয়া মালতী বাড়ী আসিল, সে দিন শঙ্করী আমোদে আটখানা হইয়াছিল, যুবকযুবতীকে একান্তে রাখিয়া নিজে অন্তরাল হইতে সব কথা শুনিয়াছিল। রসময় দরিদ্র-সন্তান বুঝিয়া শঙ্করী প্রথমে ভয়ে শিহরিয়াছিল বটে; কিন্তু পরে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে, মালতী যখন ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি; রসময়ের উপরে মালতীর যে প্রীতি পড়িয়াছে, তাহার প্রবাহ-মুখ ঘুরাইয়া লইতে বড় দেরি লাগিবে না। তাই শঙ্করী পরে ব্যবস্থা করিয়া ঘনুবাবুকে আনিয়াছিল। বাবুর হিসাবে ঘনুবাবু সুপুরুষ, বয়সও খুব কাঁচা; সুতরাং প্রথম-কিশোরী মালতী ঘনুবাবুকে দেখিলেই রসময়কে ছাড়িয়া ঘনুবাবুকে ভাল বাসিবে। ইহাই শঙ্করীর হিসাব।

কিন্তু সে হিসাব ব্যর্থ হইয়াছিল। মালতী সর্ব্বদাই অন্যমনে থাকিত, সর্ব্বদাই রসময়ের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিত; ঘনুবাবুকে বড় আমল দিত না। শেষে শঙ্করী সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়া স্থির করিল যে, ঘনুবাবুর বাগানে মালতীকে রাখিয়া দিলে, অষ্টপ্রহর ঘনুবাবু কাছে থাকিলে, প্রণয়বচনের মদিরাধারা অহরহ মালতীর কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিতে থাকিলে, নবযুবতী মালতী কত দিন সামলাইয়া থাকিতে পারিবে? ঘনুবাবুর রূপ, ঘনুবাবুর নূতন যৌবন, ঘনুবাবুর অর্থসামর্থ্য, নিশ্চয়ই মালতীকে পিশাচপ্রবৃত্তির সূক্ষ্মজালে লূতাতন্তুজড়িত মক্ষিকার ন্যায় জড়াইয়া ফেলিবে। তাই ছল করিয়া, মিথ্যা কহিয়া, শঙ্করী মালতীকে ঘনুবাবুর সঙ্গে একগাড়িতে বরানগর পাঠাইতেছিল, নিজেও সঙ্গে যাইতেছিল।

(৭)

রসময় কাঁদিল; কিন্তু নয়নের ধারাপ্রবাহে মনের সকল ক্লেশ বিধৌত করিয়া ফেলিতে পারিল না। রসময় নিজের মনুষ্যজন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—জননীর পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিল; কিন্তু মালতীর প্রতি প্রণয় সে রোদনে ম্লান হইল না। বরং কাঁদিয়া, মালতীর সুন্দর ছবি রসময়ের মনে শিশিরসিক্ত প্রভাতকুসুমের ন্যায় আরও যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অথচ রসময় মালতীকে দেখিতে পায় না। দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও, লজ্জায় ও ভয়ে মালতীকে দেখিতে যাইতে পারে না। একদিন দুইদিন করিয়া কতদিন কাটিয়া গেল; মালতীকে দেখিবার সাধ রসময়ের মনে দিনে দিনে ঘনীভূত হইতে লাগিল; শেষে, রসময়ের অসহ্য হইল। একদিন সে মালতীর খোঁজে মালতীর বাড়ী গেল, মালতীর বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ দেখিল, কোন প্রতিবেশিনীর মুখে শুনিল, মালতী বরানগরে বাগানে গিয়াছে। এইবার রসময় একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। রসময় মালতীর অন্বেষণে বরানগরের দিকে চলিল।

কোথা যাও রসময়! তোমার অতিবৃদ্ধা মা যে একাকিনী বাটীতে রহিয়াছেন; তুমি যে তাঁহাকে এ মাসের জলপানির টাকা আনিয়া এখনও দাও নাই। কোথা যাও রসময়! তোমার মায়ের যে ইহসংসারে তোমা বৈ আর কেহ নাই!

রসময় চলিল; সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া রসময় চলিল। রাত্রি দশটার পর বরানগরের এক ঘাটের উপর গিয়া রসময় বসিল। রসময়ের শ্রান্তিবোধ নাই, ক্ষুধাবোধ নাই, পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হয় নাই। রসময় ভাবিতেছে,—"কোথায়, কোন্ বাগানে

খোঁজ লই,—কাহার নাম করিয়া খোঁজ লই! মালতীর নাম করিব কি? শেষে তাহাই স্থির হইল, মালতীর নাম ধরিয়া এই নিশাকালে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া রসময় মালতীর অন্বেষণ করিবে। অমি রসময় উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া, সোজা উত্তর দিকে চলিল। পথে একটা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গান গাহিতে গাহিতে, মাঝে মাঝে বলদ ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে আসিতেছিল, রসময় তাহাকে মালতীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। গাড়োয়ান প্রশ্ন শুনিয়া বলিল, "বাবু, আর মাত্লামীর জায়গা পেলে না? এই কচি বয়সে এমন!" রসময়ের মানাপমান ত নাই; রসময় সদুত্তর না পাইয়াও সোজা পথ চলিতে লাগিল। একজন কনষ্টবল অৰ্দ্ধনিমীলিতনেত্রে "আঁধারে" হাতে করিয়া ভাঙের নেশায় আঁধার দেখিতেছিল, এমন সময়ে রসময়ের পদশব্দ শুনিয়া "কোন্ হ্যায় রে" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোতে রসময়ের মুখচোখের ভঙ্গী দেখিয়া কনষ্টবল সিং সিদ্ধান্ত করিল যে, রসময় মাতাল, সুতরাং কিছু প্রাপ্তির আশায় ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তু মাতুয়ারা হ্যায়, চল্ থানা চল্।" ম্লানমুখে রসময় উত্তর করিল, "কোথায় যাব?"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "ছোড়্ দেও, বাবু সরাব নহিঁ পিয়া হ্যায়।" সসম্ভ্রমে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কনষ্টবল উত্তর করিল, "যো হুকুম স্বামিজীর!" কে আবার বলিল "চুপ!" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে রসময়ের ঘাড়ের উপর কে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "চলুন মহাশয়, আপনি কোথায় যাবেন, আপনাকে সেইখানে পঁহুছিয়ে দিয়ে আস্ছি।"

রস। আপনি কে? আমার প্রতি আপনার এত দয়া কেন? অন্ধকারে আপনাকে ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি না; আপনি কি সন্ন্যাসী?

উ। আমার পরিচয়ে প্রয়োজন? আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমি রেখে আস্‌ব। এই অন্ধকারে আপনি ঠাওর ক'রে যেতে পার্‌বেন না।

রস। আমি যে কোথায় যাব, তাই আমি জানি না, একটা বাগানে একটি স্ত্রীলোক এসেছেন; আমি তাঁরই খোঁজে যাচ্ছি।

উ। সে স্ত্রীলোকটি কোন্ বাগানে, কাহার বাগানে আছেন?

রস। তা আমি জানিনে। তবে স্ত্রীলোকটির নামটি জানি; নাম বলিলে যদি আপনি ঠিকানা করিতে পারেন ত নামটি বলিতে পারি। তাঁহার নাম—মালতী।

উ। বড় কঠিন ব্যাপার! আচ্ছা, চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক্ না। আপনার ভঙ্গী দেখে বোধ হ'চ্চে, আপনার আহার হয় নাই, কিছু খাবেন কি?

রস। এই রাত্রে আপনি আমায় কি খাইতে দিবেন? মালতীর সন্ধান করিয়া পরে জলগ্রহণ করিব।

সন্ন্যাসিঠাকুর সকল ব্যাপার বুঝিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি রসময়ের সঙ্গ ছাড়িলেন না। দুইজনে নিস্তব্ধ নিশা-কালকে পদশব্দে মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। অনিবার্য্য ঘটনাস্রোতে উভয়ে ভাসিয়া যাইতেছেন, অনিবার্য্য স্রোতের বেগে দুইজনেই এক

অজানা অবস্থায় গিয়া পড়িবেন;—কিন্তু একজন বিহ্বল, অন্য-জন সংযত। হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত ইহাতেই সূচিত হয়; এই ঘাত-প্রতিঘাতে রসময়ের মনোবেগ যে নূতন গতিতে প্রবাহিত হইবে, এইখানেই তাহার পতাকাস্থান।

কতক পথ হাঁটিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে একটা বাগানবাড়ীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গার উপরেই বাগানবাড়ী, বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ফল ও ফুলের বড় বাগান। দোতলা বাগানবাড়ী, উপরে একটা ঘরে বাতীর আলো জ্বলিতেছে। সেই ঘরে রাত্রি বারোটার পরও লোকে জাগিয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। যে দিকে রসময় ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই দিকের একটা জানালার কপাট কে খুলিয়া দিল। আর আলোকে রসময় একখানি মুখ দেখিতে পাইল, সে মালতীর মুখ। রসময় সন্ন্যাসীকে ধরিল, আর কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—"ঐ, ঐ আমার মালতী!" সন্ন্যাসী রসময়ের মুখে হাত দিয়া বলিলেন, "চুপ!" সন্ন্যাসী যাহা দেখিতেছিলেন, রসময় ত তাহা দেখিতে পায় নাই!

(৮)

গাড়ী চলিল; গাড়ীর সম্মুখের বসিবার স্থানে ঘনুবাবু একলা বসিয়া আছেন, আর ঘনুবাবুর সম্মুখে অপর দিকে শঙ্করী ও মালতী বসিয়া আছে। গাড়ী চলিল; সকলেই নিস্তব্ধ, শব্দের মধ্যে কেবল গাড়ীর ঘড়্ঘড়ানি। গাড়ীর মধ্যে অন্ধকার, কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না; ঘনুবাবু চুরুটও খাইতেছিল না। তবে, গাড়ীর মধ্যে মালতীর অবস্থিতি অনুভব

করিয়া ঘনুবাবু যেন কেমন হইয়া বসিয়া ছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে শঙ্করীর অন্ধকারমাখা মুখখানিতে মধ্যে মধ্যে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল। শঙ্করীর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মালতী ঘনুবাবুরই হইবে,—লাভ শঙ্করীরই; তাই তাহার মুখে হাসি। মালতীর ভাবনা মালতীই ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না;—কখনও ভয়ে তাহার বুক দুর্‌দুর্ করে, কখনও আশায় সে দুর্‌দুর্ শব্দ শান্ত হয়, কখনও বা নৈরাশ্যে শরীর-মন যেন এলাইয়া পড়ে। মালতীও যেন কেমন হইয়া বসিয়া ছিল। মেঘনাদের কেমন-কেমন ভাব, আর মালতীর কেমন-কেমন ভাবে অনেক পার্থক্য ছিল। মেঘনাদের কর্ণে আশা নানা কথা কহিতেছিল, মেঘনাদের দৃষ্টির সমক্ষে বিলাস নানা ছবি আঁকিয়া দিতেছিল, মেঘনাদের হৃদয়ে বাসনা নানা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিতেছিল; মেঘনাদ বিভোর হইয়াছিল। মালতীর কর্ণে কেবল রোদনধ্বনির ঝঙ্কার শুনা যাইতেছিল; কেন না, বড় আশঙ্কা, পাছে রসময়ের মাতৃবিয়োগ হয়! মালতীর দৃষ্টির উপর মাতৃশোকবিহ্বল রসময়ের নানা রূপ যেন খদ্যোতবিকাশের মত মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মালতীর হৃদয়ে কেবল নৈরাশ্যের অবসাদ। মেঘনাদ ও মালতীতে অনেক পার্থক্য।

গাড়ী যথাকালে বরানগরের বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মালতীকে শঙ্করী ধরিয়া নামাইল, মেঘনাদ গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া শঙ্করীর হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দিব্য দ্বিতল বাটী,—একেবারে গঙ্গার গর্ভের উপর অবস্থিত! শয়নকক্ষ হইতে কলনাদিনী মন্দাকিনীর কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ অষ্টপ্রহর শুনা যায়। সকল কক্ষই অতি সজ্জিত, অতি সুন্দর।

মালতী শঙ্করীর হাত ধরিয়া উপরের বসিবার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। “কৈ, রসময়—কৈ? তাঁহার মুমূর্ষু বৃদ্ধা মাতা কৈ?—এ কোথায় আসিলাম, এ যে আমার সর্ব্বনাশের ফাঁদ!” কোথাও কাহাকে না দেখিতে পাইয়া এই কয়টি কথা মালতীর মনে জাগিয়া উঠিল। পলকের মধ্যে মালতী সব বুঝিতে পারিল। ভয়ে, ক্ষোভে, রোষে, মালতী কাঁপিতে কাঁপিতে একখানি সোফার উপর বসিয়া পড়িল। পাকা শঙ্করী মালতীর মনের সকল কথা বুঝিতে পারিল। শঙ্করী ভাবিল, “ও ঝোঁক্‌টা দুইএকদিনে চলিয়া যাইবে।” এমন সময়ে মেঘনাদ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মালতীকে মুগ্ধার ন্যায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ঘনুবাবু হাসিয়া বলিল, “আর দুঃখ ক’রে কি হবে? এখন তুমি আমার। রসময় দরিদ্র, কুৎসিত; তাহার নিজের পেটের ভাত নাই, সে তোমায় আদর ক’র্‌বে কেমন ক’রে? তুমি আমার হও, আমিও তোমার হব। আমার সর্ব্বস্ব তোমারই হবে।”

এই বলিয়া বালক মেঘনাদ মালতীর দিকে অগ্রসর হইল। মালতী উঠিয়া দাঁড়াইল। শঙ্করী, মালতী ও মেঘনাদের মধ্যে আসিয়া বলিল, “না, জোর ক’র্‌বেন না। এত তাড়াতাড়ি কিসের! স্থির হোন, মুখ-হাত-পা ধোন।” মেঘনাদ বুঝিল, কাজটা তত ভাল হয় নাই, সে নিরস্ত হইল।

এইবার মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। নীল নয়ন দুইটি হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল; আক্ষেপ নাই, দীর্ঘনিশ্বাস নাই, গদগদ কণ্ঠশব্দ নাই,—মালতীর চক্ষু-দুইটি হইতে সচ্ছিদ্র-কলস-বিগলিত জলধারার ন্যায় অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। নিদাঘমেঘের বর্ষণে যেমন ধরাবক্ষ কথঞ্চিৎ শীতল হয়, এই রোদনে

মালতীর উত্তপ্ত হৃদয় তেমনি কথঞ্চিৎ শীতল হইল। মালতী একটু সাম্‌লাইল।

কিন্তু, মালতী কেন কাঁদে,—কাঁদিয়া কি লাভ? ঘনু এই কথা বুঝাইবার জন্য আবার মুখ ফুটিয়া বলিল, "মালতি, তোমার কান্না বৃথা। তোমার মাকে তোমার জন্য আমি আজই অনেকগুলি টাকা গণিয়া দিয়াছি। আর তোমাকে এই বাড়ীতে ঈশ্বরী করিয়া রাখিব বলিয়া তোমাকে এখানে আনিয়াছি। মাসে মাসে অনেক টাকা তোমার মাকে গণিয়া দিতে হইবে! তুমি বেশ্যাকন্যা, তোমার বেশ্যার বৃত্তি, তাই তোমার রূপ যৌবন দেখিয়া তোমার মায়ের অনুমতিক্রমে তোমাকে এত যত্ন করিয়া এখানে আনিয়াছি; গৃহস্থের কন্যার মত এখন কাঁদিলে আর কি হইবে? আমি যাহা বলিব, তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। তুমি আমার কথা শুনিলে আমি তোমার কথা শুনিব। তুমি এখানে সম্পূর্ণ আমারই বশ।"

মালতী সকল কথাগুলি স্থিরভাবে শুনিয়া অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিল, আরও একটু যেন সাম্‌লাইল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "একটু স্থির হইবার জন্য আমাকে দুইদিন সময় দিন। এ ব্যবসায় আমার এই নূতন। আমার মাকে কাল কলিকাতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবেন।"

একগাল হাসি হাসিয়া মেঘনাদ বলিল "বেশ, তাই হবে; তুমি যা' ব'লবে, আমি তাই ক'রব। তুমি আমার হইলে, আমি তোমার কেনা-গোলাম হইয়া থাকিব।"

মালতী কোন উত্তর করিল না। বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী রাখিয়া অন্যমনস্কভাবে নখ খুঁটিতে

লাগিল! শঙ্করী মালতীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ভাবিল, "এ আবার কি রকম! একি সত্যি, না ছল! যদি ছল হয় ত উপায়? ঘনু ছোঁড়া ত অতি কাঁচা, সে এ সব বুঝবে কি? সে ত কা'ল সকালেই আমায় তাড়াবে। যদি মালতীর মনে আর কিছু থাকে, যদি মালতী রসময়ের পিরীতে পাগল হয়ে থাক, তবে ত সে একটা কারখানা ক'রবে! লক্ষণ ভাল নয়, রসময় ছোঁড়াকে খুঁজে বা'র ক'র্ত্তে হ'চ্ছে। মালতী আমার সব, আগে মালতী, তবে টাকাকড়ি—আমোদ-প্রমোদ। মা কালী, যা ভাল হয়, তাই ক'রবেন।"

হায় মা! তোমার দোহাই কে না দেয়! পাপীও তোমার দোহাই দেয়, পুণ্যবান্‌ও তোমার নাম করে; বেশ্যাও তোমার ভরসায় বাঁচিয়া থাকে, সাধুও তোমায় স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হয়। মনস্কামনা ত সকলেরই পূর্ণ হয়। তুমি কেমন মা? তোমার কাছে কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, মা?

শঙ্করী পরদিন প্রাতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই রসময়ের খোঁজ করিল, কিন্তু কোন খবর পাইল না। মালতী একদিন কি কথায় কথায়, রসময় যে কলিকাতার কোথায় থাকিত, শঙ্করীর কাছে তাহার একটু আভাস দিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া বহু কষ্টে রসময়ের বৃদ্ধা মাতার ঠিকানা করিয়া শঙ্করী, বুড়ীর বাড়ী যাইল। বুড়ী, রসময়কে একদিন না দেখিতে পাইয়া পাগলিনীর মত হইয়াছিল। শঙ্করী যাইয়া বৃদ্ধার যথেষ্ট শুশ্রূষা করিল; তাহাকে স্নান করাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা পাইল। বুড়ী প্রত্যহ স্নানান্তে রসময়কে আশীর্ব্বাদ করিত; নানা দেবতার কাছে মাথা কুটিত। আজ রসময় কাছে নাই, গত রাত্রি হইতে বুড়ী

রসময়কে আহার দেয় নাই, তাহার গায়ে হাত বুলায় নাই। বুড়ী আর কি থাকিতে পারে! কেবলই মাথা কুটিতে লাগিল। বৃদ্ধার শুষ্ক চর্ম্মসার মুখখানি ক্ষণেকের মধ্যে ফুলিয়া উঠিল। সে স্ফীতিরেখা এখনও অস্ফুট, এখনও বুড়ী মাথা কুটিতেছিল। শঙ্করী বিপদে পড়িল, সে-ও স্নানাহার ভুলিয়া বুড়ীর সেবায় নিযুক্ত রহিল।

এ আবার কি? শঙ্করী এমন কেন হইল? রসময় মালতীর জন্য পাগল হইয়াছে, শঙ্করী মালতীকে সাম্‌লাইবার জন্য রসময়ের খোঁজে আসিয়া তাহার বৃদ্ধা মায়ের ভার স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলিয়া লইল। স্নেহের তীব্রবিকাশ দেখিলে মানুষ এম্নিই হয়। শঙ্করীর ছেলে ছিল, শঙ্করী মা হইতে শিখিয়াছিল, শঙ্করী মায়ের এমন ছবি দেখিয়া আত্মহারা হইবে না! শঙ্করীর মালতী যাহাকে ভালবাসে, এ মা তাহারই মা! কাজেই শঙ্করীর হৃদয়ে একটা প্রলয় ঝড় বহিয়া গেল। মা, এ-ও কি তোমার লীলা?

পরদিন, ঘনুবাবু বাগানে ছিল না। সারাদিন বাজার করিয়া মেঘনাদ সন্ধ্যার পর বাগানে আসিল, মালতী একলাই বাগানে ছিল। তাহার চক্ষে জল নাই, মুখে হাসি নাই, দেহে উল্লাসভাবও নাই। কেমন-যেন কাষ্ঠপুত্তলিকার মত সে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দিন কাটাইয়াছিল।

মেঘনাদের আজ ভঙ্গী স্বতন্ত্র। সে বাগানে আসিয়াই একবার স্নান করিল; স্নানান্তে এক-গেলাস সিদ্ধির সরবৎ পান করিয়া আহারে বসিল। আহারের পর এক-পেগ হুইস্কিও চলিল। কাঁচা বয়স, মেঘনাদ এত নেশা সাম্‌লাইতে পারিল না; তামাক

টানিতে টানিতে তাহার মাথা ঘুরিয়া আসিল। যদুবাবু বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

মেঘনাদ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া চতুরা মালতী তাড়াতাড়ি লোহার সিন্দুকের কড়ায় একটা মোটা দড়ি বাঁধিয়া জানালার পথে নীচে নামাইয়া দিল। শেষে গাছকোমর বাঁধিয়া সেই দড়ি ধরিয়া নিজেও নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। অনেকটা নীচু দেখিয়া সে যেন একটু ভয় পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই দড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

(৯)

সন্ন্যাসী সব দেখিতেছিলেন,—দেখিয়া ব্যাপার বেশ বুঝিয়াছিলেন। মালতী যাই ঝুলিয়া পড়িল, তিনি অমনি ত্বরিতপদে জানালার নীচে যাইয়া দড়ি ধরিয়া মালতীকে নামাইয়া লইলেন। মালতী জ্ঞানশূন্যা, দুই হাতের চামড়া ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখচোক যেন নীল হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী অন্ধকারে অত কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তবে অনায়াসে মূর্চ্ছিতা মালতীর স্পন্দহীন দেহ স্কন্ধের উপর স্থাপন করিয়া, দক্ষিণহস্তে রসময়ের হাত ধরিয়া সেই অন্ধকার রজনীতে ধীরপদে চলিতে লাগিলেন। রসময় নির্ব্বাক্ হইয়া সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। কতক্ষণ চলিয়া উভয়ে গঙ্গার একটা বাঁধাঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন; একখানি ভাউলিয়ার উপর উঠিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "শশি! ওঠ, আলো জ্বালো।" শশী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিল, ভাউলিয়ার ভিতরে বিছানা পাতিয়া দিল। সন্ন্যাসিঠাকুর এতক্ষণ

পরে মালতীর মূর্চ্ছিত দেহ স্কন্ধ হইতে নামাইয়া অতি সন্তর্পণে বিছানার উপর শোয়াইলেন। তাহার পর ল্যাম্পের আলোতে মালতীর মুখ-চোখ দেখিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, নৌকা ছাড়। মহাশয়, আপনি বসুন।" রসময় এই কথা শুনিয়া ভাউলিয়ার বাহিরে বসিয়া পড়িল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

রসময়, এ কি স্বপ্ন! এমন সুস্বপ্ন আর কখনও দেখিয়াছ কি? এ সন্ন্যাসীই বা কে? দেহে এত বল—সন্ন্যাসীর হয় কি? সন্ন্যাসীর এত প্রভুত্বই বা কোথা হইতে হইল? পুলিশের কনষ্টবল তাঁহার তাড়নায় চুপ করে, ঘাটের মাঝী বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকা ছাড়িয়া দেয়,—কে এ সন্ন্যাসী?—কে এ মহাপুরুষ? এমন রূপও ত কোথাও দেখি নাই! ঢালা-মাজা সোণার মত দেহের বর্ণ আকর্ণবিশ্রান্ত বড় বড় দুইটি চক্ষু, চোখের বড় বড় পাতা, সুদীর্ঘ পল্লবের দ্বারাও সে ডব্‌ডবে নয়ন-দুটিকে ঢাকিতে পারে না; বিশাল বাহু, বিপুল বক্ষ, সুদৃঢ় পেশীবিন্যস্ত দেহ,—গৈরিক বসন,—কে এ সন্ন্যাসী? রসময়ের কোন পরিচয় চাহিলেন না, মালতীর কোন সমাচার লইলেন না, অথচ রসময়ের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন—কে এ মহাপুরুষ?

স্রোতের মুখে ভাঁটার টানে নৌকা কলিকাতার দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, শশি-মাঝী হা'ল ধরিয়াছে, দুইজন দাঁড়ী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গঙ্গার শীতল বাতাস গায়ে লাগিয়া রসময় প্রকৃতিস্থ হইল এবং সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বড় পিপাসা, একটু জল খাব।" সন্ন্যাসী তরিকক্ষ হইতেই উত্তর করিলেন, "ওরে শুধু জল দিস্‌নে, ওই ওখানে সন্দেশ আছে, দুইটা সন্দেশ দিয়া তবে জল দিস্।" একজন দাঁড়ী নিঃশব্দে এই

আজ্ঞা পালন করিল। রসময় জল পান করিয়া আরও সুস্থ হইল।

এদিকে কক্ষের মধ্যে বসিয়া সন্ন্যাসিঠাকুর মালতীর মুখে-চোখে জল ছিটাইয়া হাওয়া দিতে লাগিলেন, ভাউলিয়ার সকল বাতায়নপথ খুলিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ পরে মালতীর সংজ্ঞা হইল। সন্ন্যাসী অম্নি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "শশি, দুধ আছে না? শীগ্‌গির গরম ক'রে দাও।" একজন দাঁড়ী নৌকার ভিতর হইতে ষ্টোভ বাহির করিয়া দুধ গরম করিয়া দিল। সন্ন্যাসী দুধের বাটী হাতে লইয়া মালতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উঠ মা, এই দুধটুকু খাও।" চকিতনেত্রে মালতী চাহিয়া দেখিল, অপরিচিত লোক দেখিয়া আবার নয়ন নিমীলন করিল। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "ভয় নাই মা, এই দুধ খাও।" এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চামচ করিয়া দুধ তুলিয়া ধীরে ধীরে মালতীর মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। মালতী দুধ খাইয়া একটু বল পাইল, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না,—হাতে ও মাথায় বড় ব্যথা। এইবার সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া রসময়কে ভিতরে যাইতে অনুমতি করিলেন। রসময় বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। সে দেখিল, নৌকার দাঁড়ী-মাঝী—সব গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, নৌকায় ঔষধ-পথ্য সবই আছে;—ইহারা কাহারা?

রসময় নৌকার ভিতরে যাইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসিঠাকুরের দিকে একবার চাহিল। ঠাকুর ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আমরা বাগবাজারের ঘাটে গিয়া উঠিব। আপনি আশ্রয় পাইবেন। আপনার মালতী আরোগ্য লাভ করিলে, আপনি

যথায় ইচ্ছা যাইতে পারেন। ওকি! অমন করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কি দেখিতেছেন?—স্বার্থত্যাগী হইয়া পরের এইরূপ দুঃখ দূর করাই আমাদের ব্রত ও ধর্ম্ম।” রসময় কিছুই বুঝিতে পারিল না, কলের পুতুলের মত নৌকার ভিতরে গেল। মালতী রসময়কে দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিয়া বসিল এবং সবিস্ময়ে বলিল, “তুমি!—তুমি এখানে! তুমিই আমাকে আনিয়াছ? ইঁহারা কাহারা? আমি কোথায়?”

রস। ও সকল কথা পরে হইবে, তুমি স্থির হও। যিনি তোমাকে মিলাইয়াছেন, তিনিই সন্ন্যাসীকে দিয়াছেন, তিনিই তোমার উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন; আমি কিছুই করি নাই।

এই বলিয়া রসময় সাদরে মালতীর মাথায় হাত দিয়া তাহার মুক্ত কুন্তলরাশি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। মালতী অতিসুখে নয়ন মুদিত করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চুপ করিয়া রহিল। ইহাই কি ঘটনাস্রোত? না ইহাই লীলা—অজ্ঞেয়, অপরিমেয় লীলা? যাহা ঘটিবে, তাহাই ঘটাইবার জন্যই কি এই সমাবেশ? এম্নি সমাবেশেই ত সংসার চালিত! অনেকক্ষণ পরে মালতী আবার বলিল—

“এই রাত্রে এই গঙ্গার উপর, তোমাকে এই মাথার কাছে রাখিয়া, সন্ন্যাসিঠাকুরের পদধূলি লইয়া মরিতে পারি যদি, তা হ’লে কত সুখ! কেমন, না?”

রস। ছিঃ, অমন কথা মুখে এনো না। তোমার জন্য আমি সব ছাড়িয়াছি, অঘটন ঘটিয়া তবে তোমাকে পাইয়াছি। তুমি এখন মরিবে কেন,—মরিতে দিবই বা কেন?

রসময়ের কথা শুনিয়া মালতী শুষ্কমুখে একটু হাসিল।

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। উপরে পাল্কী প্রস্তুত ছিল, মালতীকে লইয়া সন্ন্যাসিঠাকুর বাগবাজারের কোন-একটা বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

(১০)

চতুরা শঙ্করী তিনদিন সেবা করিয়া রসময়ের বৃদ্ধা মাতাকে বশ করিয়াছে; কেবল বশ করাই নহে, বৃদ্ধাকে রসময়-ঘটিত সকল কথাই বলিয়াছে, আর রসময় যে মালতীর সন্ধানে ঘুরিতেছে, সে কথাটুকুও বলিয়াছে। বৃদ্ধা দিনে দিনে একটি একটি করিয়া সকল কথাই শুনিয়াছেন; শেষে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বুড়ী শঙ্করীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"তা হোক না, রাঁড়ের মেয়ে হ'লোই বা, ঠিক বেশ্যার মেয়ে ত নয়;—হোক, আমি তাকেই ঘরে নেব। আমার রাসুর যাতে সুখ, আমাকে এখন তাই ক'র্ত্তে হবে। এই বুড়ো বয়সে শেষে তাকেও কি হারাব! তার ধর্ম্ম তার কাছে মা, আমি তাকে রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি।"

শঙ্করী। এই কথাটি মা, আমায় এতদিন বল নি! আমি কবে রাসুবাবুকে ও মালতীকে খুঁজে আন্‌তে পাত্তুম। যাক, যা হবার তা হয়েছে; আমি কা'ল সকালেই রাসুবাবুকে ও মালতীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ব।

বৃদ্ধা। ও কথা ব'ল্‌তে যে আমার কত কষ্ট হয়েছে, তা তুমি কি বুঝ্‌বে মা! রাসু আমার অন্ধের যষ্টি, সে লেখাপড়া শিখে দশজনের একজন হবে, ভদ্রঘরে বিয়ে ক'রে সুখে সংসার ক'র্‌বে, তার ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'দিন আমি সকল জ্বালা

জুড়ুবো ;—আমার ত এই সাধ মা! রাসুর হাতের জল শুদ্ধ থাক্‌বে, আমার মুখে গঙ্গাজল দেবে—এই ত আমার সাধ মা! কিন্তু আমার পোড়াকপাল—হতভাগী আমি, পোড়া বিধাতা আমার সাধ মিটুবেন কেন! কোথায় ছেলে মানুষ হবে, না ভূত হ'ল! যাক সে সব। এখন রাসুকে হারিয়ে শেষে অপঘাতে মর্‌ব, পথে-ঘাটে প'ড়ে থাক্‌ব! কাজেই সে রাঁড়ই বিয়ে করুক্‌, খেরেষ্টানই হ'ক, প্রাণের দায়ে আমাকে সবতাতেই রাজী হ'তে হবে। ভাগ্যে ভাগ্যে মর্‌তে পার্‌লে বাঁচি, আমার হাড় জুড়োয়!

এই বলিয়া বৃদ্ধা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। শঙ্করী সব বুঝিল,—বুঝিয়া সে-ও কাঁদিল! সে যদি সরস্বতীর সঙ্গে না আসিত—তাহারও ঘর-সংসার থাকিত, তাহারও সুখ হইত।

এমন সময়ে কে বাহির হইতে 'মা' বলিয়া ডাকিল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কে, আমার রাসু এলি? আয় বাবা আয়; আমাকে কি এতদিন এক্‌লা ফেলে থাক্‌তে হয় বাপ্‌! আয় কাছে আয়, আমি তোর গায়ে হাত দিই।" এই বলিয়া বুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, রসময়ই আসিয়াছিল। মায়ে-পোয়ে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে বৃদ্ধা বলিলেন—

"বাবা, আমার কাছে ভাঁড়িয়ে কি হবে? বাবা! তুমি যাকে ঘরে আন্‌বে, সেই আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমার আর ক'দিন! আমি তোমায় সুখী দেখ্‌লেই কৃতার্থ হই। আমি সব শুনেছি, সব বুঝেছি। তুমি তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এস, আমি উলু দিয়ে ঘরে তুল্‌ব। তুমি আমার ইহকাল-পরকাল। আমার জাত-কুল সব তুমি। আমার কাছে তোমার লজ্জা কি?"

রসময় মায়ের কথা শুনিল, শুনিয়া কাঁদিল।—সে সুখের, কি দুঃখের কান্না, বলা যায় না। কিন্তু রসময় মায়ের মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারে নাই। যে মা রসময়কে তুই তোকারী করিয়া কথা কহিতে ভালবাসিতেন, যে মা রসময়কে না ধমকাইয়া কথা কহিতেন না, যে মা রসময়ের একটু বেচাল দেখিলে মাথা কুটিয়া কপাল ফুলাইতেন, যে মা রসময়ের ভাল ঘরে বিবাহ দিবার জন্য সুখের কত আকাশকুসুম গড়িতেন, বধূ লইয়া ঘরসংসার পাতিবার কত কত মধুর ছবি মনে মনে আঁকিতেন, সেই মা অতি সংযত ভাষায় "তুমি আমি" করিয়া রসময়ের সহিত কথা কহিতেছেন। বৃদ্ধার কর্ম্মনিষ্ঠা, বৃদ্ধার আচারবুদ্ধি, বৃদ্ধার ধর্ম্মভাব অত্যধিক ছিল,—সেই বৃদ্ধাই আপনার একমাত্র সন্তানকে বিধবার বয়স্থা কন্যা বধূরূপে ঘরে আনিতে বলিতেছেন। ধন্য মা! এমন না হইলে কি তোমাদের জগদম্বার প্রতিমা বলে! মুগ্ধ রসময় এমন মায়ের মর্ম্ম কি বুঝিবে!

রসময় বেহায়া—পাগল হইয়াছিল; মায়ের কথা শুনিয়া সে মাকে বলিল, "তোমার যদি মত হয় ত কা'লই তাকে এখানে আন্‌তে পারি।"

মা। বি—য়ে হবে; না,—না,—হাঁ,—তা কা'লই নিয়ে এস। তা বাবা, আজ রাত্রে আমার কাছে থাক না, কা'ল সকালে গিয়ে নিয়ে এলেই ত হবে! কতদিন তোমাছাড়া হয়ে আছি, খানিকক্ষণ তোমার চাঁদমুখখানি দেখি, তোমাকে কাছে নিয়ে থাকি! গোপাল আমার, যাদু আমার, তাই কর।

রসময় নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। কে যেন তাহাকে বলিল, "রসময়, আজ রাত্রে মার কাছেই থাক।"

রসময় মায়ের কাছেই রহিল। আহারাদি করিয়া মায়ের

কাছেই শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিল। আহারান্তে রসময় শঙ্করী কেমন করিয়া সেখানে আসিয়াছে, সে সংবাদ শুনিতে বসিল; শঙ্করী যেন অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে সব ঘটনা বুঝাইয়া বলিল। রসময়ও সন্ন্যাসিঘটিত সকল ব্যাপার ও পলায়ন-কাণ্ড —সব বলিল। সে আরও বলিল, "মালতী এখন বাগবাজারে আছে, সুচিকিৎসায় সে সারিয়া উঠিয়াছে, একজন গৃহস্থের কন্যা তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে।" কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া গেল; সকলেই ঘুমাইল।

অতি প্রত্যূষে শঙ্করী তাড়াতাড়ি আসিয়া রসময়কে ঠেলিয়া তুলিল! হাঁপাইতে হাঁপাইতে ব্যস্তভাবে বলিল, "উঠ উঠ, তোমার মায়ের অবস্থা খারাপ, বোধ হয়, এখুনি তাঁকে গঙ্গাযাত্রা ক'র্‌তে হবে। দৌড়িয়া গিয়া লোক ডেকে আন।"

রসময়। ব্যাপার কি? মা কোথা? কি হয়েছে?

শঙ্করী। যা হবার তাই হয়েছে, রাত্রে তাঁর একটু পেটের অসুখ হয়েছিল। এখন একেবারেই হাতপায়ে খাল্ ধ'রেছে, নাড়ী নেই, শ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যাও, শীঘ্র লোক ডাক।

রসময় ছুটিয়া লোক ডাকিয়া আনিল। হরিবোল দিয়া সকলেই বৃদ্ধাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে—ব্রাহ্মলগ্নে, রসময়ের পুণ্যবতী মাতা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে স্বর্গারোহণ করিলেন। রসময়ের বধূ লইয়া তাঁহার আর ঘর করা হইল না। রসময় জন্মের মত মাতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিল।

এ-ও—কি স্বপ্ন? রসময়! যা হারাইলে, তা আর পাইবে না।

(১১)

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রসময়ের ভাগ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। সংসারে তাহার আর আপনার বলিবার কেহ রহিল না, কেবল স্বর্ণসূত্রে বাঁধা রহিল মালতী। সন্ন্যাসীরা রসময়ের মাতৃশ্রাদ্ধের সকল জোগাড় করিয়া দিলেন। একমাস পরে রসময় শুদ্ধ হইল। রসময়ের দুই ভাবনা। প্রথম ভাবনা—মালতীর জন্য। তাহাকে কোথায় রাখিবে, তাহাকে লইয়া কি করিবে? দ্বিতীয় ভাবনা—সন্ন্যাসীর। এ কেমন সন্ন্যাসী! কোন কথা নাই, তবু তিনি রসময়ের জন্য এত করেন কেন, রসময়ের জন্য এত ভাবেন কেন? সন্ন্যাসীর ভাবনা ভাবিবার পূর্ব্বে মালতীই রসময়ের মন জুড়িয়া বসিল! চাক্‌রী-বাক্‌রী নাই, মালতীকে লইয়া রসময় কি করিবে, কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে! শঙ্করী কিন্তু এই সময়ে রসময়ের যথেষ্ট সহায়তা করিল। শঙ্করী বলিল—

"বাবু, আপনার মায়ের কাছে থাকিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছে। তিনি দেবী, স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছেন, জোর করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন; আমার আর এ সব ভাল লাগে না। আমার যা-কিছু আছে, মালতীকে দিয়া আমি বৃন্দাবনে যাইব। আমার রেলের ভাড়া ও পাঁচটি টাকা হইলেই হইবে। সর্ব্ব-সমেত আমার পাঁচহাজার টাকা আছে, সে সব মালতীর ও আপনার। আমি যখন মরিব, তখন সংবাদ পাইলে সেই সময়ে আমায় দেখা দিবেন। আমি এখানে আর থাকিব না।"

রসময় শঙ্করীর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনেও কেমন-একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। সন্ন্যাসীর

ব্যবহারে, মায়ের হঠাৎ মৃত্যুতে, শঙ্করীর কথায়, রসময় কেমন-এক-রকম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মালতীর রূপ, মালতীর তীব্র ভালবাসা, এখনও তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। রসময় কোন উত্তর করিল না দেখিয়া মালতী বলিল, "ও মা, তুমি বৃন্দাবনে গেলে আমি আর কার ভরসায় থাকিব? আমার আর আছে কে? আমার ঘর-বাড়ী, জিনিষ-পত্র কোথায় রাখিব, কাহাকে দিব, কে ভোগ করিবে?"

শঙ্করী। যার কপালে আছে, সেই ভোগ ক'র্‌বে, মা! সে ভাবনা তোমার-আমার নয়। তবে তোমার নূতন বয়স, নূতন সব, মনের মতন মানুষও পেয়েছ; তোমার যা আছে, তুমিই ভোগ ক'র্‌বে মা! আমার যা আছে, সেও ত তোমার। তোমার যা ইচ্ছা, তাই করিও।

মালতী। আমার সাধ এ জন্মে মিটিবার নয়। আমার জন্যে বাবু মাতৃহীন হ'লেন, আমার জন্যে তুমি সংসারত্যাগী হ'লে, আমার কপালদোষে আমি সব পাইয়া হারাইলাম। বিধাতা নিশ্চয়ই আমার জন্মকালে বাদ সাধিয়াছিলেন, আমার অপূর্ণ সাধ চিরকালই অপূর্ণ থাকবে। সন্ন্যাসিঠাকুর সেদিন ব'ল্‌ছিলেন যে, যার যা, তার তাই সয়; যার যা নয়, তার তা সয় না। আমি এক-রকম বেশ্যারই কন্যা, বেশ্যারই বৃত্তি আমার শোভা পায়; কুল-কন্যার ব্যবহার করিতে চাহিলে আমার তাহা সহিবে কেন?—আমাকে কষ্ট পাইতে হইবে। সমাজে ত আমার স্থান নাই, কিন্তু তার জন্যে আমার দুঃখ নেই, দুঃখ কেবল এই—আমার জন্যে অন্যে কষ্ট পায় কেন? আমার যা কিছু আছে, সব বাবুকেই দিলাম, তিনি বিয়ে ক'রে সংসারী হোন, আমি

দেখে সুখী হই। আর তাঁর মাতাঠাকুরাণীও স্বর্গে থেকে দেখে আহ্লাদ করুন। বেশ্যাজন্মের আমার ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

রসময় মালতীর এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; কি বলিবে, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল। মালতী রসময়ের রোদন দেখিয়া বিচলিতভাবে তাহার কাছে গিয়া বসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "ছিঃ কাঁদে কি। তোমার কান্না দেখ্‌লে, আমি যে পাগল হয়ে উঠি। কেঁদো না,—তুমি যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'রব। আমার ইহকাল তুমি; যদি আমার পরকাল থাকে, তা-ও ত তুমি। কেঁদো না।" এই কথা বলিতে বলিতে মালতীরও চক্ষে জল আসিল। শঙ্করী গতিক বুঝিয়া আড়ালে গেল, তাহারও চোখে জল দেখা দিয়াছিল।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়। দূর বিদেশে যাইয়া উভয়ে পতিপত্নীর মত থাকিবে,—ইংরেজী আইনের প্রভাবে বিবাহ করিয়া পতিপত্নীর মত থাকিবে; এবং রসময় চাকুরীর চেষ্টা দেখিয়া চাকুরী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। মুঙ্গেরে রসময়ের এক আত্মীয় আছেন, তিনি ব্রাহ্ম; রসময় এম্‌-এ পাস করিয়াছে, অন্য কিছু না হউক, বি-এল দিয়া সে ত মুঙ্গেরেই ওকালতী করিতে পারে। বেশ সূক্ষ্মভাবে পরামর্শ হইল, পরামর্শমত কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ হইতে লাগিল। শঙ্করী, উহাদের সহিত মুঙ্গেরে যাইয়া কিছুদিন তথায় থাকিয়া, উহাদের ঘরসংসার পাতাইয়া দিয়া বৃন্দাবনে যাইবে, স্বীকার পাইল।

পরদিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসিঠাকুর আসিলেন। রসময়ের

মুঙ্গের-যাত্রার প্রস্তাব তিনি শুনিলেন ;—শুনিয়া বলিলেন, "দেখ, হঠাৎ সর্ব্বস্ব উঠাইয়া মুঙ্গের যাইও না। এখানে মালতীর বাড়ীখানা আছে, তাহাতে কম্‌বেশ দশহাজার টাকার সামগ্রীপত্র আছে। সব ওলট্‌-পালট্‌ করিয়া হঠাৎ নূতন স্থানে যাইও না। মন খারাপ হইয়া থাকে, চল পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি ; আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। এখানকার বাড়ীঘর দেখিবার জন্য আমি বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিব। কি বল ?"

সন্ন্যাসীর কথার উপর প্রতিবাদ করিয়া কথা কহিতে কাহারও সামর্থ্য ছিল না। সকলেই সেই রায়ে রায় দিল। কথাবার্ত্তার পর ধার্য্য হইল যে, শঙ্করীকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তবে সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে।

(১২)

মেঘনাদ বসু একলা বরানগরের বাগান-বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। রাত্রি কাটিয়া গেল, পরদিন বেলা দশটার সময় তাহার জ্ঞানোদয় হইল। নিদ্রাত্যাগ করিয়া বাবু দেখিলেন, মালতী ঘরে নাই। অনেক খোঁজ-খবর পড়িয়া গেল, মালতীর কোন ঠিকানাই হইল না। শেষে মেঘনাদ বুঝিল, এ কাজ রসময়ের। এই ভাবনা হওয়াও যা, অগ্নি রোষে, ক্ষোভে, ঈর্ষায় মেঘনাদের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। মেঘনাদ বড়লোকের ছেলে ; শৈশব হইতে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছে। এখন সে ইচ্ছা-পথে অন্যে বাধা দিলে বাবু সহিবেন কেন ? ইহার উপর বিলাস-প্রিয় উন্মত্ত যুবক মেঘনাদ মালতীর রূপে মুগ্ধ—একেবারে দিশে-হারা, সেই মালতী তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। মেঘনাদ

প্রতিজ্ঞা করিল যে, মালতীকে যে-কোন-উপায়ে হউক, পাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করীকে শাসন করিতে হইবে, রসময়কেও জব্দ করিতে হইবে; এই স্থির করিয়া ঘনুবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া মেঘনাদ মাসেক-কাল খোঁজখবর করিল। পরে রসময়-মালতী-ঘটিত সকল ব্যাপার জানিতে পারিল। মেঘনাদ বুঝিল যে, রসময় এখন সহায়-সম্পত্তি-যুক্ত, তাহাকে জব্দ করা সহজ হইবে না। তবে গোয়েন্দার সাহায্যে মেঘনাদ জানিতে পারিল যে, রসময় প্রভৃতি সকলে শীঘ্রই পশ্চিম যাইতেছে, মেঘনাদের এই অবসর। মেঘনাদ সকল জোগাড় করিয়া রাখিল, যেদিন রসময় রওনা হইবে, সেইদিন সে-ও যাইবে।

মালতী, রসময়, শঙ্করী ও সন্ন্যাসিঠাকুর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যেদিন হাওড়া-ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠেন, সেইদিন মেঘনাদও নিজের দলবল লইয়া সেই গাড়ীর অন্য কামরায় উঠিয়াছিল। আর কেহ না দেখুক, শঙ্করী তাহা দেখিয়াছিল। শঙ্করী মেঘনাদের ভাবনা খুবই ভাবিত। অতগুলা টাকা তাহার নিকট হইতে গণিয়া লইয়াছে, অথচ মালতী তাহার হইল না,—অথচ মেঘনাদ এখনও সে বিষয়ে কাহাকে কোন কথা বলে নাই; এমন কি, মেঘনাদ কাহারও সহিত সাক্ষাৎও করে নাই! সত্য বটে, দুইহাজার-পাঁচহাজার জলে পড়িলেও মেঘনাদের বিশেষ-কিছু আসে-যায় না; কিন্তু মেঘনাদ একরোখা লোক, সে মালতীকে চায়—মালতীকে পায় নাই; পায় নাই বলিয়াই এতদিন কোন গোলমাল করে নাই।

এতদিন তাহার আশা ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই, এখন সে সবই করিতে পারে। শঙ্করী এই ভাবের নানা ভাবনা ভাবিয়া প্রমাদ গণিল। সে স্থির বুঝিল, বিদেশে কোনরূপ উৎপাত করিবার জন্যই মেঘনাদ তাহাদের সঙ্গ লইয়াছে। এই সব ভাবিয়া শঙ্করী ভয়ে-আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠিল।

গাড়ী ছাড়িয়াছে,—ডাকগাড়ী হু হু শব্দে চলিয়াছে, তাহার শব্দে ও ঝাঁকানিতে আরোহিমাত্রেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না—কথা কহিতে পারিতেছে না; এমন সময়ে শঙ্করী ধীরে ধীরে সন্ন্যাসিঠাকুরের পার্শ্বে গিয়া বসিল; ধীরে ধীরে শঙ্করী মেঘনাদ-ঘটিত সকল কথাই ঠাকুরকে বলিল; সন্ন্যাসী সব জানিতেন, তবুও শঙ্করীর মুখে সে সব কথা আবার শুনিলেন। তিনিও মেঘনাদকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়াছিলেন, মেঘনাদের সঙ্গে কে কে আছে, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী শঙ্করীর কথা শেষ হইলে বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ও ভার আমার, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।"

পরদিন বেলা ১২টার সময় সকলেই কাশীতে গিয়া পঁহুছিলেন; সন্ন্যাসীর পরামর্শমত মানমন্দিরের কাছে বাসা লওয়া হইল। মেঘনাদও কাশীতে নামিয়াছে।

(১৩)

রসময় ও মালতী সন্ন্যাসিঠাকুরের সহিত হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশান দেখিতে গিয়াছেন; প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহারা কেদারনাথ

দর্শন করিয়া আসিবেন, এই ব্যবস্থা। রসময় ও মালতী সন্ন্যাসিঠাকুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্মশানের এক পার্শ্বে গিয়া বসিল। শ্মশান-বৈরাগ্যজনিত অনেক কথাই হইল, অনেক শাস্ত্রালোচনা চলিল। মাতৃবিয়োগের পর হইতে রসময় কেমন-যেন-একটু অন্যমনস্ক, মালতীর মুখ দেখিলেও কেমন-যেন উদাসভাবে বসিয়া থাকে।

শ্মশানের চারিদিকে চিতাধূম উঠিতেছে, চিতাভস্ম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, চারিদিকে ক্রন্দনধ্বনি শুনা যাইতেছে,—এমন স্থানে ঔদাস্য হইবারই কথা। রসময় শূন্যমনে, শূন্যদৃষ্টিতে অনন্ত শূন্যের প্রতি তাকাইয়া আছে। ভাব বুঝিয়া মালতী একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার তখনই রসময়ের হাত ধরিয়া সেইখানেই একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসি-ঠাকুর উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বড় গ্রীষ্ম, তোমরা দুজনে খানিকক্ষণ বসিয়া গঙ্গার হাওয়া খাও, একটু বিশ্রাম কর, আমি অতি নিকটেই একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিব।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

যদুবাবু ছায়ার ন্যায় ইহাদের অনুসরণ করিতেছিল, মালতীর রূপে সে পাগল। অন্তরাল হইতে সন্ন্যাসীকে স্থানান্তরে যাইতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মালতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুবাবুর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব। সে বাস্তবিকই সুপুরুষ,—অমন মুখ-চোখ, অমন রং, অমন গড়ন-পেটন, বাঙ্গালী যুবকের প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে বিলাসী বাবুর পরিচ্ছদে তাহার রূপের আলো যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ছিল, আজ

প্রগাঢ় প্রণয়ের ফুৎকারে সে বিলাস-ভস্ম উড়িয়া গিয়াছে, রূপযৌবনের অনলশিখা নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির-ভাবে জ্বলিতেছে। যদুবাবুর পায়ে জুতা নাই, মাথায় টেড়ী নাই, দেহে সার্ট নাই, মুখে চুরুট নাই। বড় বড় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল কপালে, ভ্রূর উপরে, গণ্ডে, কণ্ঠে পড়িয়া আছে। আর এই অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশির ভিতর হইতে তাহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষুদুইটি যেন অহরহ জ্বলিতেছে। নয়নের সে স্থির দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে কোন মনোভাবই বুঝা যায় না। তাহার কাঁধের উপর হইতে একখানি চাদর ঝুলিয়া বুকের দুই পার্শ্ব ঢাকিয়া আছে, একখানি বস্ত্র যেমন-তেমন করিয়া কোমরে জড়ান আছে; আর দেহের গোলাপী রং যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, একটু টুস্কি মারিলেই যেন রক্ত ছুটিয়া বাহির হয়।

যদুবাবু মালতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, মালতী মেঘনাদকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; রসময়ও মেঘনাদকে দেখিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কেহই কোন কথা বলিল না ক্ষণেক পরে মেঘনাদ রসময়ের দিকে তাকাইয়া বলিল—

"রাসুবাবু আপনার দোষ নাই। মালতীর জন্যে সকলেই সব করিতে পারে। মালতীকে দেখিলে, যাহার হৃদয় আছে, সে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। আমিও তাই হয়েছি। প্রথমে আপনার উপর বড়ই রেগেছিলুম, খুন ক'রে ফেল্‌বার জোগাড় ক'রেছিলুম।' কিন্তু কাশীতে এসে আর সে ভাব নেই; আমি নিজের হৃদয় দিয়ে আপনাকে বুঝেছি। মালতি, একবার এই দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও, আমি তোমায় দেখি। আমি তোমায় কেবল দেখ্‌তেই এসেছি। পাগল ভেবে হেসো না!"

মালতী মরালের মত গ্রীবা বাঁকাইয়া ঘনুবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। ঠিক সেই সময়ে দূরে একটা নূতন চিতা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার আকাশবিস্তারী অগ্নিশিখার জ্যোতিতে মালতীর মুখখানি কহ্লালের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল; চিতার লাল-নীল অগ্নি-জিহ্বায় মালতীর আরক্তিম কপোলযুগলে কত রূপের খেলাই হইতে লাগিল। মেঘনাদ অনিমিষনয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া উন্মত্ত যুবক বলিয়া উঠিল।—

"আ—মরি মরি! এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই। তোমায় দেখিতে দেখিতে আমি মরিয়া যাই, আমার চিতাবহ্নিতে তোমার মুখখানি এম্নি ভাবে জ্বলিয়া উঠুক, আর জগৎসংসার তাই দেখুক। মালতি, একবার আমার দিকে তাকাও! দেখ, আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি। মালতি, তুমি কি-জানি-কি! তোমায় দেখিলে আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না,—তোমার রূপের স্মৃতি লইয়া কেবল মরিবার সাধ হয়। তুমি কি মালতি! আমাকে এমন কেন ক'র্‌লে মালতি!" এমন সময় রসময় বলিয়া উঠিল, "দেখুন, দেখুন ঘনুবাবু, ঐ যে চিতাটা জ্ব'ল্‌ছে, তার আলোয় আমরা সব দেখ্‌তে পাচ্ছি; ঐ চিতাটার মধ্যে মালতীর মত কে একটা যুবতী পুড়্‌ছে। পোড়ালেই পুড়্‌তে হয়—না?"

"হয় বৈ কি! যে পোড়ায়, তা'কেও পুড়্‌তে হয় বৈ কি, নইলে আগুন হবে কোথা থেকে। কাঠে ত কত-কি পোড়ায়, কিন্তু সে নিজে পোড়ে না কি? সে নিজে পোড়ে ব'লেই ত আগুন হয়। যে পোড়ে, সে পোড়াতে পারে,—পবিত্র ক'র্ত্তে পারে। ধূপধুনাও পোড়ে, পুড়িয়া সংসার সৌরভে পূর্ণ করে,

কিন্তু পুড়ে পুড়েই ত সে আগুন হয়! তাই তাঁতে হাত দিলে হাতও পুড়ে যায়।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিঠাকুর সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী চমকিয়া উঠিল, রসময় হাসির রোল তুলিল, ঘনুবাবু যেন লজ্জিতভাবে চলিয়া যাইতে চাহিল। সন্ন্যাসি-ঠাকুর মেঘনাদের হাত ধরিয়া তাহাকে সেইখানেই বসাইলেন এবং বলিলেন, ঘনুবাবু, একটু বসুন, কিছুক্ষণ পরে কেদারনাথের আরতি আরম্ভ হবে, তখন উঠিয়া যাওয়া যাইবে—এখন একটু বসুন।" পুত্তলিকার ন্যায় ঘনু সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বসিয়াই মেঘনাদ বলিল, "আমার এখানে বসাটা ভাল হ'চ্ছে না। আমি এতক্ষণ ব'সে, এমন ক'রে মালতীকে কখনই দেখিনি,—আমি যাই, আমাকে মাফ করুন।"

এই বলিয়া মেঘনাদ আবার উঠিল, সন্ন্যাসী আবার তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, এবং বলিলেন, "আচ্ছা,—মালতীকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, ভাল ক'রে তাকিয়েই দেখুন না!"

ঘনু। হো, হো, হো—ভাল ক'রে কি দেখা কখনও হয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আত্মহারা হ'য়ে যেতে হয়, আর দেখা যায় না; দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেবল চোখের পলক পড়ে, আর দেখা হয় না; দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিশ্বাস ফেল্‌তে হয়, আর দেখা হয় না; দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন কোথায় উড়ে যায়, আর দেখা হয় না। দেখ্‌ব কি,—দেখ্‌তে কি জানি, দেখ্‌তে কি পারি! তবে আমার দেখায় এখন একটু বেশী মিষ্টতা আছে, রসময়ের সেটুকু আর নাই। আমি যখন দেখি, তখন ভাবি, এ সোণার মালতী ত আমার নয়, এইবেলা যতটুকু পারি, দেখিয়া লই! আমি যখন দেখি, তখন ভাবি, এমন সাধের মালতীকে যখন-তখন ত দেখ্‌তে পাব

না, এখন যতটুকু পারি, দেখিয়া লই! আমি লুকাইয়া দেখি, চুরি করিয়া দেখি, ভয়ে ভয়ে দেখি, আমি পাগল হইয়া দেখি! আমি জানি, মালতী আমাকে ভালবাসে না, রসময়কে ভালবাসে। সে রসময়ের দিকে ভালবেসে যখন তাকায়, তখন আমি দূর হ'তে যেটুকু দেখ্‌তে পাই, রসময় তা দেখ্‌তে পায় না। না—আর থাক্‌ব না, আর সাম্‌লাতে পার্‌ব না,—এত ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়, আমি পালাই,—মালতি, আমি যাই।

এই বলিয়া পাগল ঘনুবাবু ছুটিয়া পলাইয়া দূরে গাঢ় অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল। মালতী এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, সন্ন্যাসীও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রসময় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে ভীষণ শ্মশানে এ আবার কেমন সংঘটন।

অতি গভীর রাত্রে সকলেই বাসায় ফিরিয়া গেলেন। রসময় কোন কথা কহে না, কেমন হইয়া থাকে; মালতী সর্ব্বদাই শিহরিয়া উঠে, আবার যেন কাহার পদশব্দ শুনিয়া সাবধান হয়; সন্ন্যাসিঠাকুর গম্ভীর ও ধীর, অগাধসাগরের ন্যায় তাঁহার কোন মর্ম্মই বুঝা যায় না। শঙ্করী বাসার সকলের আহারাদির জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, বিশ্রামান্তে সকলেই আহার করিয়া শয়ন করিলেন। মালতী শুইল না, বসিয়া রসময়ের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। রসময় কিছুক্ষণ পরে মালতীর হাত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে বসাইল, ভাল করিয়া সব দেখিবার জন্য প্রদীপের আলো একটু উস্কাইয়া দিল, শেষে মালতীর চিবুক ধরিয়া সাদরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মালতি, তুমি আমায় সত্য ভালবাস ?"

মালতী। এ আবার কি কথা! সোহাগ দেখাচ্ছ না কি?

রসময়। না না, সোহাগ দেখান নয়, আজ ঘনুবাবুর রকম দেখে মনে হ'ল যে, ভালবাস্‌তে হয় ত অম্নি ক'রেই ভালবাস্‌তে হয়। ভালবেসে পাগল না হ'লে, ভালবাসাই হ'ল না। আমি ত অমন ক'রে ভালবাস্‌তে পারি নি! তবুও কি তুমি আমায় ভালবাস?

মালতী। ব'ল্‌তে পারিনে, তবে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে হ'লে কি যে হয়, কেমন ক'রে জানাব! তোমার জন্যে আমি বাজারের বেশ্যা হ'লুম না; তোমার জন্যে আমি সাধুসঙ্গে কৃতার্থ হ'লুম। তুমি আমার,—আমারই থাক্‌বে,—এইটুকুই জানি।

রসময়। উত্তর হ'ল না। ঘনুবাবুর ভালবাসাটা তোমার ভাল লাগে কি? দেখ, লোকটা কি ছিল, কি হয়েছে; দুষ্ট ছিল, সাধু হয়েছে; বিলাসী ছিল, হৃদয়বান্ হয়েছে; সত্যিসত্যিই তোমার জন্যে পথের পাগল হয়েছে। তাকে ভাল লাগে কি?

মালতী। ভাল লাগে কি না, এখনও ঠিক ব'ল্‌তে পারি না; তবে তার প্রতি একটু যে মায়ার ভাব হ'য়েছে, এটা ঠিক। আগে ঘৃণা ক'র্ত্তেম, ভয় ক'র্ত্তেম, কিন্তু কাল্‌কে তাকে দেখে সে ঘৃণা ও ভয়ের ভাব আর তেমন নাই। তার আলুথালু বেশ দেখে মনে একটু ব্যথা লেগেছিল, তার হিংসা-শূন্য ভালবাসার প্রগাঢ়তা দেখে একটু কেমন-কেমন বোধ হয়েছিল। আমার সে দয়ার পাত্র।

রসময়। হরিবোল্ হরি! সত্যি কথাটাও এত ক'রে ঘুরিয়ে ব'ল্‌বে! মালতি, তুমি ঘনুবাবুর হও, তাকে বাঁচাও। পারি যদি, আমিও ঘনুবাবুর মত পাগল হয়ে,—বিভোর হয়ে, ঘুরে বেড়াই! আমি তোমার যোগ্য নই।

মালতী। দেখ, আমি যদি তোমার পত্নী হ'তেম, তা হ'লে তুমি এত কথা ব'ল্‌তে পার্‌তে কি? তা হ'লে তুমি ঘনুবাবুকে অতক্ষণ অমন ক'রে আমার কথা কইতে দিতে পার্‌তে কি?

রসময়। হো—হো, কি ফাঁকির জবাব! মালতি, তুমি আমাদের নায়িকা, নায়িকার ভাবেই তোমার এত পূজা; স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই তোমার এত আদর! এখন তোমার সেই স্বাধীনতার জোরে ঘনুবাবুকে কি আদর ক'র্ত্তে চাও—আমাকে কি ছাড়্‌তে চাও?

এইবার মালতী কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল—"এখন বুঝেছি, আমার প্রতি তোমার আর তেমন ভালবাসা নেই। দুদিনের খেয়াল দুদিনেই মিটে গিয়েছে! ঘনুবাবু আমার কে যে, তোমাকে ছেড়ে তাকে ভালবাস্‌ব! ছিছি, এমন ক'রে আর আমাকে কষ্ট দিও না।"

রস। আমি তোমার কে যে, তুমি আমাকে ভালবাস্‌লে? মালতি, কেউ কারও নয়। তোমার রূপ তোমার, আমার ভালবাসা আমার। তুমি আগুন, আমি পতঙ্গ। মেঘনাদও একটা পতঙ্গ। সে পুড়্‌ছে বটে, কিন্তু এখনও ছাই হয় নি। আমার কথা এই যে, তুমি তাকে দয়া ক'র্ব্বে,—কি তাকে ছাই ক'রে ফেল্‌বে? আর আমার?—আমার ত স—শ—য—হ—ক্ষ হয়ে গিয়েছে। আমি তোমায় ভালবেসে আমার মন বুঝেছি, আমি তোমার রূপে পুড়ে ম'রে আর একটা রূপ দেখ্‌তে পেয়েছি, সে রূপ আমি আমার ক'রে আমার হৃদয়ে এঁকে রেখেছি। চোখ বুজ্‌লেও সে রূপ আমি দেখ্‌তে পাই, আবার চেয়ে থাক্‌লেও তাকে দেখ্‌তে পাই; আমার ভাবনা কি!

ভালবাসার মূল্য কি, তা আমি জানি। ঘনুবাবু বিনিমূলে বিকিয়েছে, তাকে দেখ্‌লে প্রাণের ভেতর কেমন করে! মালতি, যদি মন বুঝে থাক ত বুঝ্‌বে, তোমার এখন বড় সমস্যার সময়। দুদিনের মধ্যেই সে সমস্যা ঘোরালো হ'য়ে তোমার মনে জেগে উঠ্‌বে। সাবধান! মাটি বুঝে তবে পা-ফেলো!

মালতী। তুমি কি ব'ল্‌চ—শেষে তুমিও কি পাগল হ'লে? তুমি আমার স্বামী, আমার দেবতা, আমার সব,—তুমি অমন কথা কেন ব'ল্‌চ?

রস। আমি ব'ল্‌চি কি, তুমি আমায় ঠিক্ ভালবাস না। তুমি তোমার মায়ের কাছে রামায়ণ-মহাভারত প'ড়ে কুলনারীর মর্ম্ম বুঝেছ; তোমার বড় সাধ তুমি কুলাঙ্গনা হও। সেই সাধে আমি সহায়তা ক'র্ব্বো ব'লে তুমি বড় আশায় আমার হয়েছিলে। কিন্তু, আমি চাই উদ্দাম ভালবাসা। আমি তোমার জন্যে সমাজ ছেড়েছি, পাপপুণ্য ছেড়েছি, মাতৃসেবা ছেড়েছি—সব ছেড়ে দিয়ে তবে তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে ভালবেসে আমার যে লাভ হয়েছে, তোমাকে পেয়ে আমার সে লাভ হয়নি। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কুল ছেড়ে অকূলে গিয়ে প'ড়েছে,—কিন্তু তুমি কেবল কূলে আস্‌তে চাও কেন? মেঘনাদের ভালবাসা তেম্নি জোর ক'রেছে;—মনে হয়, আমার চেয়ে সহস্রগুণে বেশী জোর ক'রেছে। তোমার রূপে সে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সে মোহ তার এখন ছুটেছে, এখন সে কেবল তোমার প্রণয়ের আগুনে পুড়ে মর্ত্তে চায়! মালতি, তুমি কুলরমণী হ'তে পার না,—হবার যো নেই। জোর ক'রে হ'তে গেলে, চিরকাল তোমার মনে একটা খট্‌কা লেগে থাক্‌বেই! তুমি ঠিক হিন্দু

গৃহস্থঘরের বৌ সাজ্‌তে পার্‌বে না। তোমার যে ছনৌকায় পা দেওয়া হয়েছে। তোমার বিষম বিপদ্‌! মালতি, তোমায় ভালবাসি ব'লেই এত কথা ব'ল্লেম; তোমার দেহ, মন, প্রাণ, সবটাই চাই ব'লেই এত কথা ব'ল্লেম। সাবধান! মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলো না। এখন শোও।"

(১৪)

প্রণয় স্পর্শমণি; যাহাতে স্পৃষ্ট হইবে, তাহাই সুবর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রণয়ে পত্রাপাত্রের বিচার নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই, পাপপুণ্যের বিচার নাই। প্রকৃত প্রণয় অপাত্র বুঝে না, অধর্ম্ম জানে না, পাপ মানে না। মেঘনাদের ন্যায় বিলাসীও প্রণয়বেগে ত্যাগী—ভাবুক হইয়াছে; মালতীর ন্যায় বেশ্যাকন্যাও প্রণয়ের প্রভাবে কুলনারীর ন্যায় সংযতা মইয়াছে; আর চারিত্রাভিমানী শিক্ষাভিমানী যুবক রসময় ভালবাসিতে শিখিয়া বৈরাগ্যের সমাচার পাইবার যোগ্য হইয়াছে। ক্ষুদ্র মনুষ্যহৃদয়ের ভাবপ্রবাহ, একবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিলে, পতিত-পাবনী গঙ্গার ন্যায় শতমুখ প্রসারিত করিয়া, ভাবময় ভগবানের অনন্ত ভাবসাগরে মিশিতে চায়। তখন অনন্তের স্পর্শে সবই অনন্তে গরিণত হয়। রসময় তেমন ভাগ্য করিয়াছে কি?

প্রণয় গঙ্গাস্রোত, সাগরের কাছে উহা শতমুখে বিস্তীর্ণ হইবেই। রসময়ের প্রণয়বেগে ত্রিধারা লুক্কায়িত ছিল,—গঙ্গারূপে মাতৃভক্তি, সরস্বতীরূপে শৈশবস্মৃতির সূক্ষ্মধারা পিতৃভক্তি এবং ধীর, স্থির অতিগভীর যমুনারূপে নায়িকাপ্রেম। এই ত্রিধারায়

মিলিয়া রসময়ের প্রেম মহাসাগরের দিকে ছুটিতেছে। মেঘনাদের ন্যায় মত্তমাতঙ্গ এ প্রবাহের মুখে ভাসিয়া গিয়াছে; শঙ্করীর ন্যায় মায়াবিনী এ স্রোতে পড়িয়া গলিয়া গিয়াছে; আর অনুরাগ-প্রফুল্লা মালতী সদ্যঃস্নাতা জলদেবীর ন্যায় দিব্যজ্যোতি ছড়াইয়া উর্ম্মি-মালার উপর হেলিয়া-দুলিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি আর পাওয়া যায়!

রসময় ভালবাসিয়া মজিয়'ছে,—রসময় ভালবাসার বেদনা অনুভব করিতে পারে। তাই মেঘনাদের উন্মাদভাব দেখিয়া সে ভাবিয়া আকুল হইয়াছিল, মনে মনে কতই কাঁদিয়াছিল, মালতীকে মেঘনাদের প্রতি একটু করুণার ভাবে চাহিতে বলিয়াছিল। রসময় প্রগাঢ় ভালবাসায় বুঝিয়াছিল যে, ভালবাসাই ভালবাসার মূল্য,—ব্যক্তিবিশেষ নহে, রূপবিশেষ নহে। অমর্ত্ত্য অশরীরী প্রেম প্রথমে মর্ত্ত্যেরই একটা কিছুর আশ্রয়ে বিকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন সূর্য্যকিরণের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন আর পাত্রবিচার, রূপবিচার, কিছুই থাকে না—মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য হইয়া যায়। আকাশের কোলে সূর্য্যালোক প্রথমে রাঙা মেঘের রূপেই ফুটিয়া থাকে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন স্বয়ং সূর্য্যের উদয় হয়, জগৎ আলোকে ডুবিয়া যায়, তখন সে রাঙা মেঘ আর দেখা যায় না, সূর্য্যকিরণে তাহা লয় হইয়া যায়। রসময়ের রাঙা মেঘ মালতী; কিন্তু এখন রসময় প্রণয়সূর্য্য মাথায় করিয়া অনন্ত আকাশে উদিত হইয়াছে, তাই সে রাঙা মেঘ সে আর দেখিতে পাইতেছে না। মালতী রসময়ের মর্ম্ম এখন কি বুঝিবে, মালতী রসময়ের কথার ভাব এখন কেমন করিয়া ধারণা করিবে!

মালতী ভাবিল, তাহার প্রতি রসময়ের প্রণয়বেগ যেন একটু কমিয়াছে, কারণ রসময় ত তাহাকে এখন পাইয়াছে, আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে—মালতীর অপূর্ব্বত্ব, মালতীর নূতনত্ব, রসময় আর গ্রাহ্য করিবে কেন? এই ভাবিয়া অভিমানে মালতী জবার ন্যায় লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মালতী মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না। মালতী কাঁদিলও না, কাঁদিলে হয় ত মালতীর পক্ষে মঙ্গল হইত।

মেঘনাদ চিলের মত মালতীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যখন মালতীকে একলা পায়, তখনই একচোখ্ দেখিয়া লয়, একটা সাধের কথা কহিয়া লয়। মেঘনাদের উন্মাদভাব দেখিয়া তাহার প্রতি সকলের লক্ষ্য থাকিলেও, তাহার গতিরোধ কেহ করে না। মেঘনাদ যখন-ইচ্ছা-তখন আসিয়া মালতীকে দেখিয়া যায়। ফলে, মালতীর সহিত মেঘনাদের এখন ঘনঘন দেখাসাক্ষাৎ হয়। মালতী মেঘনাদকে দেখিলে আর ভয় পায় না; বরং তাহার আলুথালুবেশ রুক্ষকেশ দেখিয়া মালতীর বড় বড় চোখের কোলে দুই-এক ফোঁটা জলও কখনও কখনও দেখা দেয়। একপক্ষে এই সমবেদনার সূচনা, অন্যপক্ষে রসময়ের প্রতি অভিমান! হৃদয় ও মস্তিষ্কের এই ঘাত-প্রতিঘাতে কি হইবে কে জানে!

রসময় স্বামিজীর নিকট এখন সর্ব্বদাই শাস্ত্রচর্চ্চা করে। চিরকাল সে লেখাপড়া করিতে ভালবাসিত, সে কেতাবের কীট ছিল। মধ্যে কেবল মালতীর প্রেম তাহাকে আত্মহারা করিয়াছিল। এখন সে উদ্দামভাব সংযত হইয়াছে, রসময় আবার পাঠে মন দিয়াছে। সঙ্গগুণে এই অধ্যয়ন-রতি

দর্শনশাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। রসময় সারাদিন বসিয়া স্বামিজীর সহিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করে, আর সন্ধ্যার সময় অবসর হইলে খেয়ালমত কখনও বা মালতীর চিবুক ধরিয়া আদর করে, কখনও বা তাহার সদ্যঃসজ্জিত সাধের খোঁপা খুলিয়া দিয়া একটু মিষ্ট ঝগড়ার সৃষ্টি করে। মালতী কিন্তু অভিমানভরে মনে মনে ভাবে যে, এ সোহাগ প্রকৃত নয়; এ সোহাগ-আদরের ভাবটা রাসুবাবু কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরেই দেখাইয়া থাকেন, আমায় আর তেমন ভালবাসেন না।

সন্ন্যাসিঠাকুর কেবল ঘটনার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিয়া যাইতেছেন, কোন কথাটি কহেন না, রসময়কে পাঠ দেন ও লয়েন, আর অবকাশ থাকিলে পঞ্চকোশী কাশী প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন।

অমাবস্যার রাত্রি, সন্ন্যাসিঠাকুর দুর্গাবাড়ী গিয়াছেন, শঙ্করীও সঙ্গে গিয়াছে, রসময় মানমন্দিরে যাইয়া এক পণ্ডিতকে পাইয়াছে, তাহার সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে। মালতী ঘরে একলা আছে। এমন সময়ে মেঘনাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। মালতীকে একলা দেখিয়া মেঘনাদ হাসিয়া বলিল,—

"মালতি, আজ তোমায় একলা পেয়েছি, রাসুবাবু ঐ ছাদের উপরে এক পণ্ডিতের সঙ্গে কি বড়্‌বড়্‌ ক'রে ব'ক্‌ছেন। আমার এই অবসর, দু'টো কথা শুন্‌বে কি?"

মালতী। আমার কাছে আপনার এমনভাবে আসা ভাল হয় নি। আমি আমার নহি—অন্যের। তিনি জানেন যে, আপনি আমার রূপে মুগ্ধ। এই সকল বিবেচনা ক'রে আপনার এখন আসা অন্যায় হয়েছে। পথ ছেড়ে দিন, বাহিরে যাই।

মেঘনাদ কক্ষের দরজার সম্মুখে চৌকাঠের দুই দিকে দুই হাত

দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মালতীর তিরস্কারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সে বলিল—"পিদীমের আলোয় কি এত আলো? না,—তোমার মুখের আলো? না,—আমার চোখের আলো? মালতি, তুমি আমায় পাগল ক'রেছ, তা'তে আমি সুখী। কিন্তু আমাকে মরণের সোজা পথ দেখিয়ে দিলে, আমি আরও সুখী হব। ভয় নেই, আমি তোমার গায়ে হাত দেব না,—ও আলোর দেহ, ও আলোতে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, আমি পুড়ে যাব, —তোমায় আর দেখা হবে না। একবার ভেবেছিলুম যে, রাসু-বাবুকে খুন ক'রে ফেলে তোমায় আমার ক'র্‌ব! কিন্তু সে তোমার ভালবাসার পাত্র—আমার ভালবাসার ভালবাসা! তার গায়ে কি হাত দিতে পারি! মালতি, আবার কথা কও, আমি শুনি, তোমার মুখভঙ্গী দেখি!

মালতী। সত্যিসত্যি পাগল হ'লেন না কি?

মেঘনাদ। পাগল—একেই কি পাগল বলে না কি? মা এসেছেন, বউ এসেছে, মাসী এসেছেন, আমার পাগ্‌লামী সারাবেন ব'লে—আমাকে মানুষ ক'র্‌বেন ব'লে। পাগল!—সত্যিই ত, পাগলই ত,—কিন্তু আমার বড় সুখ, বড় আনন্দ! এখন মনে হ'চ্ছে, সকল দেহটা যদি চোখ হ'ত, সে চোখে যদি পল্লব না থাক্‌ত, সে চোখে যদি জল না থাক্‌ত, তা হ'লে স্থির নয়নে তোমাকে কেবলই দেখ্‌তুম! মালতি, একবার আমার দিকে তাকাও!

মালতী। অমন ক'রবেন না; আপনি এমন হ'লে আপনার সব যাবে!

মেঘনাদ। তোমার ভাবনা ছাড়া, আমার আর কিছু 'সব'

আছে না কি? তুমিই আমার জগৎ। তুমি ডুবিলে আমি ডুবিব, আর আমি ডুবিলেও আমার 'তুমি' ডুবে যাবে। তা হোক্ মালতি, তবু আমি মরতে চাই। মালতি, মরতে পার,—মরতে জান? এস না, একসঙ্গে ডুবে মরি! আমার মত কেহই মর্‌তে পার্‌বে না, আমার মত কেউ মর্‌তে জান্‌বে না। এস না, মরি! রাসুবাবু পণ্ডিত হবে—সন্ন্যাসী হবে;—আর আমি তোমায় নিয়ে মর্‌ব। আমার মত কেউ মর্‌তে পার্‌বে না। মরবে?—মর না! তোমার-আমার মরণই মঙ্গল। সেই শ্মশানের কথা মনে আছে? যার যা তার তাই সয়, যার যা নয়, তার তা সয় না; তোমার-আমার এ সংসার সহিবে না, এস মরি!

এই বলিয়া পাগল মেঘনাদ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। মালতী চুপ করিয়া সেই কক্ষতলে বসিয়া রহিল। মালতীর অকূল ভাবনা। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে যে, রসময় তাহাকে আর ভালবাসে না, অথচ রসময়ের প্রতি মালতীর ভালবাসা পূর্ব্ববৎ প্রগাঢ় আছে। লতা সোহাগ করিয়া তমালকে জড়াইয়া থাকে, মালতীও সোহাগভরে নিশিদিন রসময়কে জড়াইয়া থাকিতে চায়; কিন্তু এখন যে তাহা পায় না। কামজা কন্যা মালতী ভালবাসার বিনিময়ে রসময়ের দেহকে নিজের করিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু তাহা আর হয় না। তাই মালতী বুঝিয়াছে যে, রসময় তাহাকে ভালবাসে না। তাই মালতী কুলকন্যা হইতে চাহে, কিন্তু কুলকন্যার শান্ত সংযত ভাব, অসীম সহিষ্ণুতার সামর্থ্য মালতীর কোথায়? মালতী কেতাবে পড়িয়াছে—সমাজে দেখিয়াছে যে, কুলনারীর বড় আদর। সেই আদর দেখিয়া সে রসময়ের পত্নী হইতে চাহিয়াছিল, অধুনা কাশীক্ষেত্রে পত্নীর মতই একত্র

বাস করিতেছিল। পরন্তু মালতীর যৌবন এখন ভাদ্রের ভরা গাঙ,—দু-কূলপ্লাবিনী, বেগশালিনী, কল্লোলিনী। রসময় শান্ত-সংযত ও সুশিক্ষিত, এ বেগ সে কি, সাম্‌লাইতে পারে! সুমার্জ্জিত শিক্ষার প্রভাবে রসময়ের প্রবৃত্তিনিচয় কতকটা অশরীরী হইয়া পড়িয়াছে, রসময় মনের ভালবাসা পাইলেই কৃতার্থ হয়। সে ভাবিত, মালতী তাহাকে মনের সবটুকু ভালবাসা দিয়াছে। তাই সন্ন্যাসিঠাকুরকে পাইয়া রসময় নিশ্চিন্তমনে কেবল শাস্ত্রালোচনা করিতেছিল। মালতীরও কাজেই উভয়সঙ্কট হইয়াছিল।

মেঘনাদের পদশব্দ শুনিয়া রসময় তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষের দিকে আসিল—দেখিল, মালতী একা বসিয়া আছে। রসময় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "মালতি, কার পায়ের শব্দ পেলুম? কে গেল?"

মালতী। ঘনুবাবু এসে পাগ্‌লামী কচ্ছিল, সে-ই তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

রসময়। আমায় ডাক্‌লে না কেন? উন্মাদ-পাগল, তার সুমুখে একলা থাক্‌তে আছে?

মালতী। সে কি ব'লে গেল জান,—"তোমার-আমার এ সংসার সহিবে না, এস মরি।" সে বলে, তুমি সন্ন্যাসী হবে, তাই শাস্ত্র প'ড়্‌চ, পরে আমায় ছেড়ে দেবে। তাই ভাবৃছি, আমার মরাই বুঝি ভাল। কি বল, মর্‌ব?

রসময়। মর্‌বে, না মার্‌বে! ছিঃ অমন কথা ব'ল্‌তে নেই।

এই বলিয়া রসময় মালতীর গণ্ডে একটী চুম্বন করিল, মরণ-ভাবনা মালতীর ক্ষণেকের জন্য উড়িয়া গেল।

(১৫)

কা'ল সকালে গঙ্গাপূজা। কাশীতে গঙ্গাদশহরার বড় ধুম, বড়ই উৎসব। রসময়, মালতী, শঙ্করী ও সন্ন্যাসিঠাকুর, এই চারজনে গঙ্গাপূজা করিয়া নৌকারোহণে কাশীর সমুদয় তীর্থ দেখিয়া বেড়াইবেন, ব্যবস্থা হইয়াছে। মালতী বাল্যকাল হইতে মেলা, উৎসব, পূজা বা অন্য সমারোহ দেখিতে ভালবাসে; রসময় তাহার দর্শনেচ্ছা পূর্ণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, মালতী একটু আহ্লাদিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রসময় মালতীকে অত্যন্ত ভালবাসিত; কিন্তু সে ভালবাসার যে রূপ,—সে রূপ মালতীর মনোমত হইত না। বিশেষ সন্ন্যাসীর সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া ভালবাসার সেই রূপ সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়াছিল;—ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবাহে বহিতেছিল। মালতীর দেহে যেমন রমণীরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি ছিল, মালতীর চিত্তেও তেমনি রমণীপ্রেমের পূর্ণ বিকাশ ছিল। সেই রূপ এবং সেই প্রেমের পূর্ণ উপভোগ করিতে হইলে রসময়কে যে ভাবে চলিতে হইত, শাস্ত্রাধ্যয়নের তীব্র আগ্রহ-বশতঃ রসময় তেমনটি করিতে পারিত না। তাই একদিন এই প্রেমের শিকল ছিঁড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; রসময় একটি চুম্বনের রসান দিয়া শিকলের ভাঙা কড়ার মুখ ঝালিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি রসময় মালতীর সহিত একটু সাবধানে চলিত, লেফাফা-দুরস্ত রাখিয়া কাজ করিত। ফলে উভয়পক্ষেই একটু সরলতার অভাব হইয়াছিল। রসময় ভয়ে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিত না, মালতী অভিমানে মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া রাখিত। এদিকের ত এই অবস্থা। অন্যদিকে মেঘনাদ মধ্যে মধ্যে কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া,

আগ্নেয়গিরির বিগলিত-নানা-ধাতু-প্রস্তরধারা-বিক্ষেপবৎ, মালতীর মুখের উপর, কাণের ভিতর, অপূর্ব্ব প্রেমের অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ কথার তপ্তধারা ঢালিয়া দিয়া যাইত। মালতী কেমন-এক রকম হইয়া পড়িয়াছিল;—কেমন বিহ্বল-বিমূঢ়-ভাবে ছল্‌ছল্‌ চোখে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া থাকিত। কি দেখিত, কি দেখিত না, তাহার মুখচোখ দেখিয়া কিছুই বুঝা যাইত না।

রসময় নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে, আর একখান পুরাতন পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, কাছে মালতী বসিয়া কেবল প্রদীপের সলিতা উস্‌কাইয়া দিতেছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। কতকক্ষণ পরে মালতী প্রদীপের হাতটা দেওয়ালের গায়ে মুছিয়া, রসময়ের পুঁথির সুতা ধরিয়া টানিয়া বলিল,—

"বলি, পুঁথি দেখাটাই কি বড় হ'ল! আমার দিকে একবার তাকাও না! সারাদিনটা ত দেখ্‌তে পাই না! সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া ক'রেও কি পুঁথি দেখ্‌তে হবে? আমার চেয়ে কি তোমার পুঁথি সুন্দর?"

রসময়। একপক্ষে সুন্দর বটে, একপক্ষে সুন্দর নয়ও বটে। আমি যতদিন, পুঁথিও আমার ততদিন; আমি যে ভাবে যখন পুঁথির রূপ উপভোগ করিতে চাহিব, আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, পুঁথি আমাকে ততদিন সেই ভাবে যখন-তখন উপভোগ-সুখ দান করিবে। এই পক্ষে পুঁথি তোমার চেয়ে অধিক সুন্দর। আমা ছাড়া তোমার একটা নিজস্ব আছে; সে নিজস্বটুকু তুমি তোমার মতন করিয়া রাখিয়া থাক, রাখিতে পার। তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পার। তাই

তুমি পুঁথি অপেক্ষা হীন। আর, তুমি মালতী—আমার মালতী; সজীব, সচেতন, প্রণয়প্রতিমাস্বরূপ—আমার মালতী! তাই তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই পুঁথি পড়িয়া মনে হই-য়াছে, তোমাকে হারাইলেও হারাইতে পারি, তাই তোমায় ছাড়িয়া ছোঁড়া পুঁথির আরাধনা করিয়া থাকি। বুঝলে?

মালতী। যে আজ্ঞে, ঠাকুর মহাশয়! ঢের হয়েছে; ও সব ওস্তাদী রাখুন। আর জ্বালাতে হবে না! কা'ল কখন্ বেরুবে, কোন্ কোন্ ঘাটে যাবে? আমরা কখন্ ফিরে আস্‌ব? সঙ্গে আর কেউ যাবে কি? ফিরে এসে আহারাদির বন্দোবস্ত কি হবে?

রসময়। অতগুলা প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর করিতে পারিব না। ধীরে মালতী,—ধীরে! প্রথম, যখন নৌকার মাঝী আস্‌বে, তখন বেরুব; দ্বিতীয়, যে যে ঘাটে মাঝীরা নৌকা বেয়ে আমাদের নিয়ে যাবে, সেই সেই ঘাটে যাব; তৃতীয়, যখন নৌকা এসে আমাদের মান-মন্দিরের ঘাটে লাগ্‌বে, তখন অগত্যা নৌকা ছেড়ে ফিরে আস্‌ব। আর কে আছে যে সঙ্গে যাবে, যে এসে দলে মিশ্‌বে, সে-ই যাবে। মনে কর, ঘনুবাবু যেতে পারেন। পঞ্চম ও শেষ, অন্নপূর্ণার আনন্দকাননে থেকে পূর্ব্বাহ্নে আহা-রাদির ভাবনা ভাবতে নেই, যা জুটবে, তাই খাব।

মালতী। যাও, সকল বিষয়ে যখন-তখন জ্যাঠামি ভাল লাগে না। সকল কথাতেই তুমি ঘনুবাবুর কথা নিয়ে এসে ফেল কেন? তোমার মৎলবটা কি?

রসময়। রাগ করিলে,—আচ্ছা আর কোন কথা বলিব না! ঘনুবাবুর চিন্তা আমিও অহরহ করি, তুমিও করিয়া থাক; সকল প্রসঙ্গে তাহার কথা উঠিবেই ত!

মালতী। তুমি আমায় ভালবাস না; আমার বোঝা আর কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পাল্লে তুমি বাঁচ! কেমন—না? কিন্তু মনে থাকে যেন, এ গাধার বোঝা আর কেউ বইবে না!

রসময়। গাধার বোঝা নয়, উটের বোঝা বল! সে কালে এবং একালেও উটের উপর অনেক আহামরি-সুন্দরী বেগম চড়িয়া থাকে; উট দেখিতে কুৎসিত, কিন্তু বোঝাটা বড়ই সুন্দর। তা বটে, আমার মত কুৎসিত উটও পাইবে না, তোমার মত সুন্দর বোঝাও মিলিবে না। দেখ, ঘনুবাবুর কথা—ভাবিবার কথা; তাই ভাবিতে হয়।

মালতী। এই ত তুমি কথা কহিতে জান, তবে আমার সঙ্গে অমন কর কেন? ভাগ্য নিয়ে সংসার, যার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে; ঘনুবাবুর ভাবনা আমরা ভাবিব কেন? আমি যদি তোমার বিবাহিতা পত্নী হ'তেম, তা হ'লে কি তুমি এমন ক'রে ভাবতে? ঘনুবাবুকে মেরেই তাড়িয়ে দিতে!

রসময়। তুমি আমার পত্নী বটে, কিন্তু কামপত্নী! ধর্ম্মপত্নী তুমি আমার হইতে পার না। চুক্তির হিসাবে তোমায় আমায় বিবাহ হইতে পারে; আইনের বাঁধনে আমরা উভয়ে আবদ্ধ হইতে পারি। পরন্তু তোমাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে পারি না।

মালতী। (বাষ্পগদগদ কণ্ঠে) কেন?

রসময়। তোমার কেন'র উত্তর দিব না কি? আচ্ছা, যখন একটু ব'লেছি, তখন সবটাই ব'লে ফেলি দেখ, আমি নিজে পাপী হইতে পারি, আমার সামর্থ্যে না কুলায় যদি ত কি করিব; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আমি এমন কিছু করিব না, যাহাতে সমাজদ্রোহ ঘটিয়া যায়। এক হিসাবে তুমি আমার দৃষ্টিতে নারীর শিরো-

মণি হইতে পার,—এবং বটেও তাই; কিন্তু আবার সমাজের দিক্ দিয়া দেখিলে আমারই দৃষ্টিতে তুমি হেয় হইয়া পড়িবে। তোমার রূপে, তোমার গুণে আমিই মজিয়াছি, আমিই মজিয়া থাকিব; তোমাকে ও আমাকে সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া আমি সমাজদ্রোহিতার পাপে লিপ্ত হইব কেন? বোধ হয়, আর স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না।

এইবার মালতী কাঁদিয়া ফেলিল, অঞ্চলের বস্ত্র চোখে মুখে চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার যে চিরজীবনের সাধ—সে ঘরণী-গৃহিণী হইবে! হায় বিধি! সে সাধেও এত বাদ! রসময় ধীরে ধীরে মালতীর হাত-ত্নইটি চোখের উপর হইতে নামাইয়া লইল, তাহার অশ্রু-কলুষিত কপোলে ত্নইটি চুম্বন করিল, তাহাকে তুলিয়া বামজানুর উপর বসাইল। ধীরে ধীরে মালতীর চূর্ণকুন্তলগুলি ভ্রূর উপর হইতে সরাইতে সরাইতে আরও ধীরে ধীরে রসময় বলিল,—

"মালতি! সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা ত্নঃখ কি জান? পুত্রের অপমান। ছেলে হয় নি,—ছেলে যে কি জিনিষ, তা ত এখনও বুঝ নাই! আমার মা মরিলেন কেন? আমার অধঃপতন দেখিয়া—সমাজে আমার ভাবী অপমানের আশঙ্কা করিয়া! ছেলের অপমানের চোট, বড়ই চোট! যেমন করিয়াই বিবাহ হউক না, আমরা উভয়ে যেমন ভাবে থাকি না, তোমার-আমার ছেলেকে লোকে কি এক পঙ্‌ক্তিতে খাইতে দিবে? আমাদের মেয়ে হইলে, তাহার কি ভাল ঘরে বিবাহ হইবে? আমরা যা করিবার, তা ত করিয়া যাইবই; পরন্তু পুত্র-কন্যা রাখিয়া গেলে চিরকালের জন্যে সমাজের সম্মুখে একটা অপ-

মানের পতাকা পুতিয়া যাইব। পুত্রপৌত্র সকলে চিরদিন আমাদের অভিসম্পাত করিবে! সেটা কি ভাল? আমাদের চিতাভস্মে যেন সব ঢাকিয়া যায়, এই আমার বাসনা! কেন এমনভাবে থাকি, এইবার সব বুঝ্‌তে পার্‌লে? আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার হৃদয়কাননের বনদেবী, আমার ইহজীবনের আরাধনার সামগ্রী। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে, পুত্রপৌত্রাদির দৃষ্টিতে ত তা নয়। কাজেই তোমার আমার দেহের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইলেই ভাল হয়।"

আর মালতীর রোদন নাই, সে অভিমানে বক্রস্ফীতাধর নাই, সে বিলাসলোলুপ নয়নভঙ্গী নাই, সে আগ্রহোদ্বেলিত হৃদয়ের থর-থর কম্পন নাই,—কপালে, গণ্ডে, কণ্ঠে প্রণয় ও সোহাগের লোহিতাভা নাই,—যুবজনমনোমোহন, যুবতী-দেহ-সুলভ বিলাস-বিকারের লেশমাত্র নাই। মালতী একেবারে পাথরের প্রতিমা হইয়া পড়িল। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা মালতী রসময়ের জানুর উপর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিত না, প্রায়ই ওজর করিয়া নামিয়া বসিত। আজ সে রসময়ের মুখের কথা শুনিয়া আসাড়-নিস্পন্দ-ভাবে তাহার জানুর উপর বসিয়াই রহিল। মাথাটি হেঁট করিয়া, মাটির দিকে চোখ দুইটি রাখিয়া, সম্মুখের দাঁত দুইটি দিয়া অধরের এক পার্শ্ব চাপিয়া ধরিয়া, মালতী রসময়ের কোলের উপর বসিয়াই রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মালতী যেন আপন-মনেই বলিতে লাগিল,—

"বেশ, তাই হবে। আমার চিতাভস্মেই সব ঢাকা প'ড়্‌বে। কিন্তু ভালবাসায় এত হিসাব থাকে কি? এত হিসাব থাকিলে কি ভালবাসা হয়?"

রসময়। আমার মা না মরিলে, বোধ হয়, আমার এত হিসাব জ্ঞান হইত না। গৃহস্থের ঘরের গৃহিণী বা কুলবধূ হইয়া থাকিবার তোমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, আমার বোধ হয়, এত হিসাব-জ্ঞান হইত না। ঘনুবাবুর প্রেমোন্মাদ দেখিয়া, তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমার হিসাব-জ্ঞানটা খাঁটি বিশ্বাসে দাঁড়াইয়াছে। মনের কথা খুলিয়া বলিলাম, মালতি, সেইটুকু বুঝিও।

মালতী। গৃহস্থের গৃহিণী বা কুলবধূ হইবার সাধটা কি মন্দ ?

রসময়। মন্দ নয়, কিন্তু ভাঙ্গা পাথরবাটি জোড়া লাগে না। একটা কার্য্যের সমাপ্তি একপুরুষেই হয় না, পুরুষানুক্রমে কার্য্যের পরিণতি ও ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর, যে ভালবাসে, সে সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসে; তার আবার অন্য সাধ থাকিবে কেন ? অন্য একটা স্বতন্ত্র বাসনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভালবাসা হয় না; সে বাসনার আবার ভাল-মন্দ কি ?

মালতী। ইষারায় আমার মাকে গালি দিও না; যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে তোমার মনের মতন কাজ হয়, তাই ক'র্ত্তে হবে। এখন শোও।

(১৬)

আজ গঙ্গাদশহরা—ত্রিলোকপাবনীর পূজা। একে কাশী, তাহার উপর কাশীপাদতলবাহিনী গঙ্গার উৎসব। যাত্রীর ভিড় অত্যধিক হইয়াছে। ঘাটের আর সোপানাবলী দেখা যাইতেছে না—কেবল নরমুণ্ডশ্রেণী। পূর্ব্বদিনের ব্যবস্থামত রসময় ও তাহার সঙ্গীগণ এক বড় বজরায় আরোহণ করিলেন। নৌকা

ছাড়িবার ক্ষণেক পূর্ব্বেই ঘনুবাবু কোথা হইতে আসিয়া লাফাইয়া নৌকায় উঠিল। তাহাকে কেহ বারণও করিল না, কেহ আদর করিয়া বসাইলও না। ঘনুবাবুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যে মালতীর নৌকায় উঠিতে পাইয়াছে, এই তাহার যথেষ্ট! ঘনুবাবুর পাগ্‌লামীর মাত্রাটাও ইদানীং একটু যেন বাড়িয়াছে। মেঘনাদ নৌকায় বসিয়া কতক্ষণ হাঁপাইতে লাগিল,—রোগের জন্য, কি পাগ্‌লামীর ঝোঁকে, তাহা বোঝা গেল না। হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া পরে স্থির হইয়া বসিল,—এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া নৌকার ভিতর মালতীকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—

"মালতি, আজ তুমি রাঙা কাপড় না পরিয়া গেরুয়া পরিলেই ভাল করিতে! দেখ না, মা গঙ্গার সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি—জলের রং গেরুয়া। এই মায়ের বুকের উপর বসিয়া, অমন চেলি কি প'রে থাক্‌তে আছে! দেখ না, আমিও একটুক্‌রা গেরুয়া প'রে এসেছি! আজ আমাদের সন্ন্যাসের দিন;—এখন বুঝতে পার্‌বে না, পরে জান্‌বে!"

সন্ন্যাসিঠাকুর মধ্যে বসিয়াছিলেন, তিনি একটু স্থির হাসি হাসিয়া ঘনুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি-রকম ঘনুবাবু! সন্ন্যাস আবার কেমন?"

ঘনুবাবু। সে কি ঠাকুর, মা গঙ্গার উপর ব'সে, সাম্‌নে কালীকে রেখে, ন্যাকা সাজ্‌ছ! হঃ-হঃ-হঃ, যখন বাড়ী থেকে পালিয়ে আস্‌ছিলুম, তখন আমার সেই আড়াই-পয়সার বৌটা আমার হাতে ধ'রে ব'ল্লে,—'আজ তুমি কোথাও যেতে পার্‌বে না, তোমার চোখ দুটো কেমন কেমন হয়েছে।' আমি তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব'ল্লুম, 'মারবো,'—সে হেসে ব'ল্লে, 'তার আর

বড়বাকী আছে! আমাকে মারো, আমি তোমার কীল-চাপড়, লাথি-জুতা সব সহিব। অন্যে সৈবে কেন? ছুঁড়ি আমায় ভালবাসে—খুবই ভালবাসে; যখন ভালবেসে কথা কয়, তখন তার মুখখানি দেখ্‌তে বেশ হয়! দেখেছ, কেমন মজা! সে আমায় ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসিনে। না, তাকে আর মার্‌বো না, আজই শেষ!

সন্ন্যাসী। কি ব'লছ ঘনুবাবু! তোমার কথা সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার ধর্ম্মপত্নী তোমায় এত ভালবাসে, আর তুমি ক্ষেপার মত ঘুরে বেড়াও!

ঘনু। পাগলের কথা বুদ্ধিমানে বুঝ্‌তে পারে না। তুমি যে বুদ্ধিমান্! রসময়কে বুদ্ধি দিয়ে সব মাটি ক'র্‌ত্তে ব'সেছ! হুঁ, আমার আবার ধর্ম্ম! আমার আবার ধর্ম্মপত্নী! মরি, কথার ছিরি দেখ না! যে ভালবেসে পাগল হয়েছে, তার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি ঠাকুর! আমি মালতীকে ভালবাসি, মালতী আমায় কি ভালবাসে? আমি মালতীর জন্যে পাগল, আমার বৌ আমার জন্যে পাগল হোক না! ইট সাজিয়ে খেলা ক'রেছ? পাশে পাশে উঁচু ক'রে ইট সাজিয়ে গিয়েছি, হাজার হাজার ইট সাজিয়ে রেখেছি। শেষে একটা ইটে ধাক্কা মেরেছি, ধুপ্‌-ধুপ্‌-ধুপ্‌ ক'রে, একটার পর একটা সব ইট প'ড়ে গিয়েছে। গোড়ায় ইটটাই গোড়ায় ধাক্কা খেয়েছে, সেই ধাক্কা অন্য অন্য ইটের মধ্যে দিয়ে সকল ইটেই গিয়েছে; নিজের নিজের ধাক্কা খেয়ে সকল ইট প'ড়েছে, শেষে যখন ইট আর নাই, তখন আর ইট পড়ে নি। এও তেমনি; ভালবাসার ব্যাপারটা ঠিক যেন ইট সাজান! কিন্তু গোড়ায় যদি কেউ ধাক্কা খায় ত সব ইট প'ড়ে যাবে। আমি

ধাক্কা মেরেছি, আমার পাশের সব ইট প'ড়বে। কেমন,—নয়? উঃ, আমি কি ভাবুক রে!

সন্ন্যাসী ঘনুবাবুর দিকে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ঘনুবাবু আবার কথা কহিয়া উঠিল,—

"মালতি, এই নূতন গঙ্গার জলে ডুবে ম'রতে কত সুখ! নূতন জল—গেরুয়া রঙ্গের জল, গঙ্গার জল;—এ জলে ডুব্‌তে পাল্লে সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়। আমি আজ ডুব্‌ব, ইচ্ছা ক'রে ডুব্‌ব না, মা গঙ্গা ডুবিয়ে নেবেন। তুমি মর্‌তে পার,—মর্‌তে জান? রসময় বাঁচ্‌বে, ওর বাঁচ্‌তে বড় সাধ! আমাদের আর কি আছে বল এস মরি।"

শঙ্করী এমন সময় বলিয়া উঠিল—"ছি ছি ঘন বাবু, অমন কথা ব'লতে নেই। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, মা গঙ্গা রক্ষা কর।"

আজ কয়দিন হইতে শঙ্করী কেমন হইয়া গিয়াছে, কেবল দুঃস্বপ্ন দেখে, আর মালতীর মঙ্গলকামনা করিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে মাথা কুটিয়া আসে।

আর মালতী, মালতী আজ স্থির, ধীর, গম্ভীর। মুখে শোণিতের রক্তিমাভা নাই, নীল নয়ন দুইটিতে সে তীব্রতা নাই, তেমন চপলার খেলা নাই, সোহাগে নাসিকার আকুঞ্চন-প্রসারণ নাই, অধরে ভালবাসার চাপা হাসি নাই, আদরের চাঞ্চল্য নাই। মালতী আজ প্রস্তরময়ী অপূর্ব্ব প্রতিমা। রসময় গতরাত্রি হইতে মালতীর পরিবর্ত্তন দেখিয়াছিল, দেখিয়া একটু ভয়ও পাইয়াছিল। আজ গঙ্গাবক্ষে এত উৎসব-আনন্দের মধ্যেও মালতীকে অত স্থির গম্ভীর দেখিয়া রসময় বড়ই ভয় পাইল; ধীরে ধীরে মালতীর কাছে গিয়া বসিল। একটি

পদ্মফুল লইয়া মালতীর নাকের কাছে ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "বল ত মালতি, তোমার মুখে আর এই পদ্মে কতটুকু পার্থক্য ?" শুষ্কভাবে মালতী বলিল,—"জানি না।"

কিন্তু প্রণয়ীর মুখে চাটুবচন নবযুবতীর কর্ণে বড় মিঠে শুনায়; মালতী রসময়ের কথা শুনিয়া একটু যেন সজীবতা প্রকাশ করিল। রসময় হাসিয়া বলিল—"জান না! আমি ব'ল্‌ছি। তোমার মুখপদ্ম লাবণ্যসলিলে সদাই ঢল্‌ঢল্‌ করিয়া ভাসিতেছে, রূপের শতদল বিস্তার করিয়া কেবল হাসিয়া ফুটিয়াছে; ও মুখকমলকে লাবণ্যসরোবর হইতে কেহ তুলিয়া আনিতে পারে না। আর, এ জলের কমল, দেখ না, সরোবর হইতে অল্প আয়াসেই ছিঁড়িয়া আনিয়াছে।"

মালতী। (একটু হাসিয়া) দুই কমলই এক; তোমার হাতের-টাকে তুমি এখনই গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে, আর তোমার পাশে যে জ্যান্ত কমল ব'সে আছে, তাকেও তুমি গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবে। তবে, জলের কমল গঙ্গার পূজায় লাগিবে, আমার মুখ-কমল গঙ্গার জলকে অপবিত্র করিবে।

রসময়। ক্ষমা কর, মালতি! আমি ভালবাসার মুখে যুক্তির বালির বাঁধ দিতে চেয়েছিলাম। আমার অপরাধ হয়েছে। তুমি আমার,—এই গঙ্গার উপর ব'সে ব'ল্‌ছি,—তুমি আমারই সব।

মালতী। কা'ল রাত্রে, এমন কথা আমাকে কেন শুনাও নি? এমনি ক'রে কেন আমায় তুষ্ট কর নি? এমনি ক'রে কাছে ব'সে, ঐ-রকম জলভরা চোখে, ঐ-রকম ঠোঁট কাঁপিয়ে, ঐ-রকম গাল রাঙা ক'রে, কেন আমায় এ সব কথা শুনাও নি?

কা'ল রাত্রে আমায় কোলে তুলে যে কথা ব'লেছিলে, সে কথা না ব'লে আমাকে পায়ের তলায় রেখে, এই কথাগুলা ব'ল্লে না কেন? আর হয় না, যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে। ভাগ্যের স্রোত সোজা বয়ে যায়, তার বাঁক নেই।

রসময়। দূর পাগলি! কি ব'ক্‌ছিস? আয়, কাছে আয়। কেমন গ্বাখ্‌ দেখি, একটু ঝগড়া ক'রে ভালবাসাটা কত টাট্‌কা ক'রে নিয়েছি!

এই বলিয়া রসময় সাগ্রহে মালতীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার অধরে, ওষ্ঠে, কপোলে, কপালে, চক্ষে, ভ্রূতে সাগ্রহে ঘনঘন চুম্বন করিতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতে 'সামাল্‌ সামাল্‌' বলিয়া মাঝীমাল্লারা একটা বিকট শব্দ তুলিল। তাড়াতাড়ি রসময় মালতীকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া উভয়ে দেখিল, পশ্চিম-আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, জোর বাতাস উঠিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের ঘাটের সম্মুখে নৌকা আসিয়াছে, কিন্তু স্রোত বড় তীব্র, জলতরঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর, মাঝীরা কিছুতেই নৌকা ঘাটে ভিড়াইতে পারিতেছে না। পশ্চিম-বাতাসের বেগে ও স্রোতের তেজে নৌকা রামনগরের পারে গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এদিকে বিষম জল-ঝড়ও উঠিল; পশ্চিমে মাঝী জল চিনিয়া বেশ যাইতে পারে, কিন্তু ঝড় তুফানে নৌকা সাম্‌লাইতে পারে না। হঠাৎ একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া নৌকাকে এক কাতে ফেলিল, মাঝীরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবু! জলে পড়ুন, এক-আধখানি কাঠ ধরিয়া তীরে উঠিলেও উঠিতে পারেন, নৌকা উল্‌টাইলে একেবারেই বাঁচিবেন না।"

এই বলিয়া মাঝীমাল্লা সকলে জলে পড়িল।

ঘন্টুবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়াছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বড় বড় চোখ্ দুইটি ভাঁটার মতন বাহির করিয়া বাহুযুগল আকাশের কোলের বিরাট-মেঘ-বিস্তারের দিকে প্রসারিত করিয়া উন্মাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঃ হাঃ হাঃ, মালতি, বরযাত্রার বাজ্‌না বেজে উঠেছে। কি মজা! চল মরি গিয়ে। রাম্বুবাবু, আর আপনি আমার চক্ষের উপর মালতীকে কোলে নিয়ে ব'সে আমোদ ক'র্‌তে পার্‌বেন না। আমার মালতীকে আমি নিলুম, পারেন ত রক্ষা করুন।

এই কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতে মেঘনাদ পলকের মধ্যে মালতীর কোমর ধরিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সকলেই লাফাইয়া পড়িল। একটা বিরাট্ জলোচ্ছ্বাস জলতরঙ্গ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিল, পরক্ষণে সব ঢাকিয়া গেল। ঢেউ যেমন উঠিতেছিল-নামিতেছিল, তেমনি উঠিতে-নামিতে লাগিল।

জলে সকলেই লাফাইয়া পড়িয়াছিল বটে, কেবল শঙ্করী নড়িয়াও বসে নাই। সে বজরার অন্য কামরায় এক পার্শ্বে একলা বসিয়া হরিনামের মালা ঘুরাইতেছিল। যখন সকলে লাফাইল, তখন শঙ্করী বলিয়া উঠিল,—"দীননাথ, যদি মর্‌তেই হবে ত এখানে বসিয়া মরি না কেন? যতক্ষণ পারি, তোমার নাম জপ করি। এ দেহের শেষ হওয়াই মঙ্গল। তুমি যেমন জান, তেমনি ভাবে আমাকে লইয়া যাও। সংসারে একটা বাঁধন ছিল—সেই সোণার বাঁধন মালতী আমার চক্ষের উপর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর কেন! এখন আমার কর্ম্ম আমি করি।"

শেষ।

আর জল-ঝড় নাই! দশহরার দশপসলা জল হইয়া গিয়াছে। রাজঘাটের বালির চড়ার উপর সন্ন্যাসী ঠাকুর বসিয়া আছেন, পার্শ্বে রসময়, আর সম্মুখে মেঘনাদ ও মালতীর মৃত দেহ গাঢ় আলিঙ্গনে সংবদ্ধ,—এত গাঢ়, এত কঠিন যে, লাস দুইটা পৃথক্ করা যাইতেছে না। রসময়ের চক্ষে জলধারা—যেন পাগলের মত ভাব; সন্ন্যাসিঠাকুর অতি কোমল ভাবে বলিলেন, "কান্নাকাটি করিবার পরে ঢের সময় আছে। এখন ইহাদের সৎকার করিবার যোগাড় দেখ। শঙ্করী লোক ডাকিতে ও কাঠ আনিতে গিয়াছে। ভাগ্যে, সে নৌকায় বসিয়াছিল, তাই আমাদের টানিয়া তুলিতে পারিয়াছিল, নহিলে, সকলেই মরিতাম। জগদম্বার কৃপা!"

দণ্ডেক কাল পরে লোকজন, কাঠকুটা সব আসিল; রসময় চিতাসজ্জা করিলেন, মেঘনাদ ও মালতীকে একসঙ্গে চিতাস্তূপের উপর শোয়াইয়া দিলেন, সকলে মিলিয়া হরিবোল দিয়া চিতায় অগ্নি ধরাইয়া দিলেন। চিতাগ্নি অপরাহ্লের আকাশ ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। মালতীর ও মেঘনাদের যুগল রূপের জ্বালা চিতার বহ্নিশিখায় মিশিয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইল।

রসময়ের সব ফুরাইল!

শঙ্করীরও সংসারের ভাবনার ভার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

সন্ন্যাসিঠাকুর রসময়ের হাত ধরিয়া বলিলেন,—

"এস ভাই, "শ্মশানে স্নান করিয়া আমরা নূতন হইয়া উঠি; যে ব্রতে আমি ব্রতী, সেই ব্রত তুমি গ্রহণ করিবে, এস। আর কেন,

সংসারের সুখ ত খুব বুঝিলে! এখন এস; আমাদের মঠ আছে, দল আছে, গুরু আছেন, কিন্তু তোমার মত ধীমান্ ভাই নাই। জগদম্বা মিলাইয়া দিয়াছেন, জগদম্বার কার্য্য হইবে। দেখ, সংসারে বিস্মৃতিই সুখ, বিস্মৃতিই মনুষ্যত্ব! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-ধামে রূপের খেলা খেলিয়া মথুরায় গিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ব্রজলীলা—রূপের খেলা, সব একেবারে ভুলিয়াছিলেন। যাহা অতীত, তাহা বিস্মৃতির অন্ধকূপে চির-নিমজ্জিত। এস—এস—এস, আমার হাত ধরিয়া আবার সংসারে এস, আবার আমরা নূতন দোকানপাঠ বসাই। কিন্তু এবারকার দোকানদারী পরের জন্যই করিব। এতদিন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, তাহা সার্থক হউক।”

রসময় আর কাঁদিল না, বালকটির মত সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ স্বামীর পদানুসরণ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল।

শঙ্করী শ্মশানের কাজ শেষ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল।

হায় রূপ!

হাবী।

(১)

হাবী গরীবের মেয়ে, বামুনের মেয়ে। হাবীর মা আছে, দিদিমা আছে; কিন্তু বাপ নাই, ভগ্নী নাই, জেঠা নাই, মামা নাই, মেসো নাই—আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। যশোহর জেলায় নকফুল গ্রামে হাবীর বাস। ইচ্ছামতী নদীর তীরে বাঁশ বন; সেই বাঁশ বনের অপর দিকে হাবীর বাড়ী। তিন খানি মেটে চালা ঘর, তিন দিকে আছে। সম্মুখে একটু ছোট রাংচিতের বেড়া; সেই বেড়ার গায়ে দু'খানি কঞ্চিতে আগড় বাঁধা। মাঝের ঘরটিতে হাবী ও হাবীর মা শোয়। ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে একটি বেতের পেঁট্‌রা, একটি ছোট কাঁটাল কাঠের হাতবাক্স, সেই পেঁট্‌রার উপর বসান আছে। পেঁট্‌রার তালা-চাবী নাই, পার্শ্বে দু'খানি কূর্ম্মপৃষ্ঠের আকারে নির্ম্মিত অতি পুরাতন পিঁড়ি। পিঁড়ির উপর তিনটি চুম্‌কী ঘটী, পিতলের একটি বড় বোগ্‌নো, লোহার হাতা বেড়ী খুন্তী, একখানি সাগুরে পাথর, তার উপর একখানি পিতলের থাল, সাজান আছে। সবগুলিই মাজা ঘসা, ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে। ঘরের আর এক কোণে একটি বিঁড়ের উপর একটি ছোট মাটির কলসী; সেই কলসীতে এক কলসী জল; আর কলসীর মুখে একখানি আধ্-

ময়লা ন্যাকড়া বাধা। ঘরের অপর পার্শ্বে বাঁশের একটু উঁচু মাচা বাঁধা আছে। মাচায় বেশ পরিষ্কার বাছা বিচালী পাতা, বিচালীর উপর একটি পুরাকালের তোষক পাতা আছে। তোষকটি এত পুরাতন যে, উহার রং দেখিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না—উপরের কাপড়খানা খেরো, কি আর কিছু! তোষকখানির উপর মোটা ডবল কাটির একটি মাদুর, সেই মাদুরের উপর পূর্ব্ব শিওরে দুটি ছোট ছোট বালিশ। বিছানার পশ্চিম দিকে আড়ায় বাঁধা একটি বাঁশের আল্না ঝুলিতেছে। সেই আল্নার উপর একদিকে একখানি লেপ ও একখানি কম্বল ঝোলান আছে। অপর দিকে দু'খানি কাপড় পাট করিয়া রাখা আছে। ঘরের মাঝখানে তেকাঠা শিকের উপর তিনটি ছোট ছোট হাঁড়ী আছে। উপরের হাঁড়ীর মুখে একটি শরা চাপা আছে। হাঁড়ীর ভিতরে কি আছে জানি না; বোধ হয়, মুড়ি-মুড়কীই থাকিবে। ঘরের এক কোণে মাচার নীচে একখানি দা, একখানি কুড়ুল ও একখানি খন্তা—একটি ছোট পাথরের টুকরার উপর সাজান আছে। এতবড় ঘরে জানালা নাই, মেঝেটি এমন নিকান-চোকান পরিষ্কার যে, সিঁদুর-টুকুও পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। বাহিরে দাওয়ার উপর একদিকে একটা ধামীতে কতকটা পেঁজা তুলো ও পাঁজ সাজান আছে। দাওয়ায় আর কিছু নাই। দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে রান্না হয়। ঘরের ঝাঁপের সম্মুখে একখানি ছোট পিঁড়ে আছে; ঘরের মধ্যে দুইটি উনান। উনানের পার্শ্বে উপরে শিকেয় বসান তেলেনি তিজেল প্রভৃতি রন্ধনের মৃৎপাত্র সকল ঝুলিতেছে। আর, উনানের পার্শ্বে মেঝের উপর একখানি লোহার কড়া উপুড় করা আছে। কক্ষের অপর দিকে, দুইটি

কলসীতে জল ভরা আছে। পশ্চিম দিকের ঘরখানিতে—ঘর কেন বলি,—চালা খানিতে দু'টি গরু ও দুটি বাছুর বাঁধা আছে। বাড়ীর উঠানের মাঝখানে একটি পুরাতন কাঁটাল গাছ। আর রাংচিতের বেড়ার দু'পাশে গুটি কয়েক গাঁদা ও দোপাটি ফুলের গাছ আছে।

এই তো হাবীর বাড়ী! হাবীর দিদিমা অতিশয় বুড়ী; কোমর ভাঙ্গিয়া কুঁজা হইয়া গিয়াছে; উবু হইয়া বসিয়া থাকিলে দুই হাঁটু ও মাথা এক হইয়া যায়! বুড়ীর পড়নে এক-খানি মোটা গড়া-কাপড়।

(২)

ফাল্গুন মাসের শেষ, বেলা দ্বিপ্রহর। পরিষ্কার আকাশে পরিষ্কার রৌদ্র গাছের কচি কচি পাতার উপর পড়িয়া যেন গলা সোণা ঢালিয়া দিতেছে। কাঁটাল গাছের উপর বসিয়া একটা কাক কেবল কা কা করিতেছে, আর মাঝে মাঝে এক একটা ভোমরা সোণার রৌদ্র ভেদ করিয়া ভোঁ করিয়া আসিয়া কচি কাঁটাল-পাতার উপর বসিতেছে, তখনই আবার উড়িয়া যাইতেছে। বৃদ্ধা দিদিমা স্নান করিয়া মালা জপ করিতেছেন।

হাবীর মা ও হাবী নদীতে নাইতে গিয়াছে, নদীর ঘাটে হাবীর মা স্নান করিয়া আহ্নিক করিতেছেন; হাবীও স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে পিতলের কলসী কাঁকে লইয়া মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ভিজা গামছাখানি বুকের উপর এবং কলসীর মুখের উপর ছড়ান আছে। হাবীর বয়স চৌদ্দ বৎসর। হাবীর এখনও বিয়ে হয় নাই। হাবী ফুট গৌরাঙ্গী নহে, কৃষ্ণাঙ্গীও নহে। হেমন্তের গঙ্গার জলের মত শীতল স্নিগ্ধ শ্যাম-বর্ণাভ তাহার রং। হাবীর গড়ন-পেটন অতি সুন্দর;

পটল-চেরা চোক দুইটি সদাই মাটির দিকেই তাকাইয়া আছে। নাকটি তিলফুল-নাসা না হইলেও বেশ টেপা-টোপা টানা। ঠোঁট দুইটির গড়ন নিখুঁৎ না হইলেও বেশ পাতলা ও সরস। হাবীর একপিঠ চুল, পিছনের দিকে ঝুলিয়া আছে। চুল এত ঘন যে, মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায় না; এত লম্বা যে, জানু ছাড়িয়াও ঝুলিয়া পড়িয়াছে, পৃষ্ঠদেশ একেবারে শ্যামা ঠাকুরুণের পিঠের মত ঢাকিয়া আছে। হাবী মাটির প্রতিমাটির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাবীর মার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। প্রৌঢ়ের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেও হাবীর মা যে, কালে একজন অসামান্যা রূপবতী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দুধে-আল্‌তার রং এখনও যেন দেহ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মুখখানি জগদ্ধাত্রী ঠাকুরুণের মত গম্ভীর অথচ হাস্যমাখা।

হাবী, মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াই আছে। হাবীর মা এক মনে দেব-আরাধনা করিতেছেন; এমন সময় ইচ্ছামতীর সম্মুখের বাঁক ঘুরিয়া একখানি চার দেঁড়ে পান্‌সী নক্ষত্রবেগে সেই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পান্‌সী হইতে একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ লাফাইয়া ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ঘাটেই হাবীকে ও হাবীর মাকে দেখিয়া বলিলেন,—"এই যে, বিন্দু পিসি এই ঘাটেই আছ, বেশ হয়েছে। আমার বড় বিপদ্, শ্রীনাথ পান্‌সীতেই আছে, তার ওলাউঠার মতন হয়েছে। তোমাদের গ্রামের মধু কবিরাজকে ডাক্‌তে হবে। তুমি পূজো সেরে পান্‌সীতে গিয়ে ব'স, আমি কবিরাজ ডাক্‌তে যাই। আয়, হাবী আয়"—এই বলিয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ হাবীকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন।

হাবী বোবা ও কালা।

(৩)

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলের একজন যোত্রবন্ত তালুক-দার। শ্রীনাথ তাঁহার এক পুত্র। ঐ অঞ্চলের সকলেই হাবীর মা বিন্দুবাসিনীকে বিন্দুপিসি বলিয়াই ডাকিত। বিন্দু-বাসিনীর স্বামী রামনাথ বাঁড়ুয্যে যশোরে নড়াইলের রায় মহা-শয়ের পক্ষের মোক্তার ছিলেন। আজ তের বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লোকটা যাহা রোজগার করিত, তাহা ক্রিয়া-কর্ম্মেই খরচ করিয়া ফেলিত। সম্পত্তির মধ্যে একখানি ছোট তালুক করিয়াছিল; সেই তালুক উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ইজারা দেওয়া ছিল। তালুকের আয় কত ছিল জানি না, তবে উমাচরণ বিন্দুপিসিকে মাসে মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা দিতেন, বৎসরের ধানটা কিনিয়া দিতেন এবং পূজার সময় হাবী, হাবীর মা ও হাবীর দিদিমাকে এক জোড়া করিয়া কাপড় কিনিয়া দিতেন। হাবীর বিবাহের জন্য বিন্দুপিসি উমাচরণের নিকট অনেকবার কান্নাকাটি করিয়াছিলেন, কিন্তু কালা বোবা মেয়ের বিবাহ হয় না বলিয়াই, এতদিন উমাচরণ সে অনুরোধ এড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। এখন পথে শ্রীনাথের উৎকট রোগ হইল, বিব্রত হইয়া উমাচরণ বিন্দুপিসির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মধু কবিরাজ আসিয়া শ্রীনাথকে বিন্দুপিসির বড় ঘরে তুলি-লেন। শ্রীনাথের ওলাউঠা সারিল বটে, কিন্তু পরে জ্বর-বিকার হইল। হাবী অষ্টপ্রহর শ্রীনাথের কাছে থাকে, একরকম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শ্রীনাথের সেবা করে। ওদিকে শ্রীনাথের মাও বাটীতে সাংঘাতিক পীড়িত বলিয়া সমাচার

আসিল। উমাচরণ ভাবিত হইলেন। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন—"গিন্নি এখন যেতে পারেন তো মন্দ কি? আমাদের উভয়ের সংসারের খেলা তো শেষ হয়েছে! আগু-পাছু নাই, আমাদের যেতে পার্‌লেই হ'লো, শ্রীনাথ আমাদের বংশধর—সৃষ্টিধর; শ্রীনাথ বাঁচ্‌লে আমাদের জলপিণ্ডের ব্যবস্থা স্থির থাক্‌বে। জগদম্বার মনে যা আছে তাই হবে, আমি তো শ্রীনাথকে ছেড়ে যেতে পার্‌বো না, গিন্নীর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।" উমাচরণ নকফুল গ্রামেই রহিলেন।

কুড়িদিন চিকিৎসার পর শ্রীনাথ বিছানায় উঠিয়া বসিল। এইবার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্নীর অবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত স্বগ্রামে যাইলেন। হাবী ছায়ার মত শ্রীনাথের কাছে থাকে। তাহার মুখ দেখিয়া তাহার সকল অভাব বুঝিতে পারে, এবং ত্বরিতপদে ক্ষিপ্রহস্তে ও নিঃশব্দে শ্রীনাথের সকল অভাব দূর করিয়া দেয়।

শ্রীনাথের বয়স আঠার বৎসর, বংশজ ব্রাহ্মণ, তাই শ্রীনাথের এখনও বিবাহ হয় নাই। উমাচরণ শ্রীনাথের যোগ্য পাত্রীও খুঁজিয়া পান নাই। অন্যদিকে বিন্দুপিসি উচ্চ কুলীনের ঘরণী; তাঁহার স্বামী রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান, স্বকৃত-ভঙ্গের বেটা। সুতরাং হাবীর বিবাহ হওয়াও বড় কঠিন।

(৪)

আজ শ্রীনাথ পথ্য করিয়াছে। সেই পুরাতন পিঁড়ির গায়ে একটি বালিশ রাখিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। হাবী পার্শে বসিয়া শ্রীনাথের নেড়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। শ্রীনাথ

সুপুরুষ; জোড়া ভুরু, জোড়া গোঁফ, টানা চোক, ফেরান মুখ, চেটাল বুক,—সুগঠিত সুঠাম যুবক! কিন্তু এখন রোগে কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনাথ। হাবি, তুমি যদি কথা কইতে পাত্তে, কত গল্পই তোমার সঙ্গে কর্‌তাম; তোমার দিদি-মা তো কালা, তোমার মা আবার পথ্য ও ঔষধ তৈয়ার করিতে সারাদিনই রান্না ঘরেই ব'সে আছেন। আর তুমি তো যা, তা তো দেখ্‌তে পাচ্চি। মা কালী এমন মানুষকে এমন ক'র্‌লেন কেন?

এই বলিয়া শ্রীনাথ হাবীর বাঁ হাতখানি ধরিল। হাবী শ্রীনাথের দিকে পলকশূন্য নেত্রে তাকাইয়া রহিল। ভালবাসিলে মনে মনে অনেক কথা হয়। শ্রীনাথ হাবীকে ভালবাসিয়াছিল, তাই হাবীর হাতখানি ধরিয়া মনে মনে হাবীকে মনের কথা কতই বলিল। হাবী শুনিতে পায় না, কথা কহিতে পারে না, কিন্তু মুখ দেখিলে মনের ভাব সব বুঝিতে পারে। কতকক্ষণ হাবী অনিমেষ নয়নে শ্রীনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল। শেষে সেই বড় ডব্‌ডবে চোখ্‌ দুইটি হইতে পুষ্পপল্লববিস্রস্ত শিশিরবিন্দুর ন্যায় টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাবী তো কথা কহিতে পারে না; হাবীর হৃদয়ের শোণিত প্রেমের উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া, অজ্ঞেয় নভোমণ্ডলের ন্যায় তাহার অজ্ঞেয় নয়নমণ্ডল হইতে বর্ষাবারিবিন্দুরূপে পতিত হইয়া, তাহার শুষ্ক বক্ষকে সিক্ত করিতে লাগিল।

শ্রীনাথ। ছিঃ, কাঁদে কি! না কেঁদেই বা ক'র্‌বে কি? কিন্তু তুমি কাঁদ্‌লে আমি যে সাম্‌লাতে পারি নে। তোমার ও মুখখানি দেখ্‌লে, তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লে, আমার এই হাড়ের

পিঁজ্‌রের পোষা প্রাণ-পাখীটি যে পালিয়ে যেতে চায়! আমি বাঁচ্‌লে সব হবে, হাবী! আমি সেরে সবল হ'য়ে উঠি, তখন যা হয় একটা কিছু ক'র্‌বো।

হাবী শ্রীনাথের মুখের কথা শুনিল না বটে; কিন্তু শ্রীনাথের মুখ-বিকৃতি দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিল,—এইটুকু বুঝিল যে, তাহার চক্ষের জল দেখিয়া তাহার শ্রীনাথ মনে বড় ব্যথা পাইয়াছে; সে তো চিরদুঃখিনী আছেই,—পোড়া চোখের দুফোঁটা জল ফেলিয়া সে ভালবাসার পাত্রকে ব্যথা দেয় কোন্ হিসাবে! হাবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সাম্‌লাইল।

এই ভাবেই দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। শ্রীনাথ সারিয়া উঠিল, তাহার মাতা ঠাকুরাণী সারিয়া উঠিলেন; উমাচরণ মুখোপাধ্যায় আসিয়া শ্রীনাথকে বাড়ী লইয়া গেলেন। হাবীর আবার সেই ঘাট, সেই মাঠ, সেই নদী, সেই বন,—সেই এক-ঘেয়ে জীবন পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কিন্তু হাবীর মন আর তেমন নাই। সে যাহা দেখে, তাহাই দেখিতে থাকে; যেখানে দাঁড়ায়, সেই খানেই দাঁড়াইয়া থাকে; আর দিবা দ্বিপ্রহরের সময় নদীতীরে যাইয়া ফিঙের খেলা, মাছরাঙার মেলা দেখিতে থাকে; নীল আকাশের উপর নীল নয়ন দু'টি রাখিয়া কাহার অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইচ্ছামতী নদীর সেই নীল জলপ্রবাহ, তেমনই তর্‌তর্ কল্‌কল্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাঁকের মুখ ঘুরিয়া বাদাম তুলিয়া বাতাসে ভর করিয়া একটির পর দুইটি, দুইটির পর তিনটি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে; কিন্তু তেমন পান্‌সী তো আর তেমন ভাবে আসে না! নারিকেল-ফলের

মধ্যে জল থাকে, সে জল কেহই দেখিতে পায় না; কিন্তু কাটারীর ঘায়ে সে জল বাহির হইয়া যায়। হাবীর বিশুদ্ধ মনের মধ্যে ভালবাসার পীযূষ সঞ্চিত ছিল, শ্রীনাথ যৌবন-প্রফুল্ল রূপের কাটারী মারিয়া সে সুধাটুকু বাহির করিয়া লইয়াছে।

(৫)

কার্ত্তিকের শেষ, সন্ধ্যাকাল; হাবী নদীতীরে সন্ধ্যার প্রদীপ দিয়া ধীরপদে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে। এমন সময় বাঁশবনের ভিতর হইতে কে-একজন লোক নিঃশব্দে বাহির হইয়া হাবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; হাবী ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেই লোকটি হাবীর কাঁধের উপর হাত দিল। অমনিই হাবি বুঝিল, এ শ্রীনাথের হাত, হাবীর জড়সড় ভাব দূর হইল; কিন্তু একটু যেন উৎকণ্ঠিত ভাবে শ্রীনাথের হাতটি ধরিয়া নদীর পাড়ের দিকে তাহাকে লইয়া গেল। কার্ত্তিকের চাঁদ উঠিয়াছে, ফট্‌ফটে জ্যোৎস্না, হাবী নয়ন ভরিয়া সেই জ্যোৎস্নায় শ্রীনাথের মুখখানি দেখিল; শ্রীনাথ হাবীকে বলিল,— "তোমার মা তো আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। আমার বাবাও বিরোধী, আমার মারও সেই মত। আমরা বংশজ, তাই তোমার মা বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। আর তুমি হাবা ও কালা, তাই আমার বাপ-মা বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু আমি তোমায় বিবাহ না করিতে পারিলে পাগল হইয়া যাইব। পান্‌সী আনিয়াছি, পান্‌সীতে টাকা পয়সা কাপড়চোপড় সবই আছে; সঙ্গে একজন বিশ্বাসী সর্দ্দার আছে, চল পালাই। বনগাঁয়ে গিয়া তোমাকে বিবাহ করিব।"

হাবী অত কথা কিছু বুঝিল না, হাতনাড়া মুখনাড়া দেখিয়া কি বুঝিল, কে জানে! কিন্তু শ্রীনাথের নির্দ্দেশমত শ্রীনাথের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গিয়া পান্‌সীতে উঠিল। মা, দিদি-মা, কুঁড়ে ঘর—সব পড়িয়া রহিল। হায় রূপ, এমন হাবাকালা মেয়েকেও তুমি পাগল করিয়া দাও! হায় রূপ, এমন সোণার চাঁদ মাতাপিতৃভক্ত পুত্রকেও তুমি উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দাও!

পান্‌সী ছাড়িয়া দিল। হাবী অকূল পাথারে ভাসিল। সেই রাত্রে পান্‌সীতে, সেই ইচ্ছামতী-নদীবক্ষের উপর হাবী শ্রীনাথকে দেহমনপ্রাণ সবই সমর্পণ করিল। হাবীর ইহজন্মে ইহজগতে যাহা কিছু ছিল, সবই তো শ্রীনাথকে দিল; কিন্তু শ্রীনাথ তাহাকে কি দিল? কি দিয়া তাহাকে কিনিল? হাবা মেয়ে বিনামূলে রূপময়ের কাছে বিকাইল!

হাবীর বিবাহ হইল না। হাবী বিবাহের বুঝে কি, বিবাহের জানে কি যে, তাহার বিবাহ হইবে? হাবী যাহা চায়, তাহাই পাইয়াছে, হাবাকালা মেয়ের মনের মধ্যে যেটুকু অভাবের উদয় হইয়াছিল, হাবী তাহাই পূর্ণ করিয়াছে।

শ্রীনাথ তিনমাসকাল হাবীকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। শেষে তাহার হাবীর জন্য বিরক্তি-বোধ হইল। ভাল, বল দেখি, একটা হাবাকালা মেয়ে লইয়া কি একজন শিক্ষিত যুবকের দিন কাটে? বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথের মনে মা-বাপের কথার উদয় হইল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ-তাপ আসিয়া জুটিল। কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় অস্থির হইয়া শ্রীনাথ সিদ্ধান্ত করিল,—যেখানকার পাপ সেইখানে রাখিয়া, আবার বাপ-মায়ের ছেলে, বাপ-মায়ের কাছে যাই।

আবার ফাল্গুন মাস। সেই ফাল্গুন, আর এই ফাল্গুন! এক অন্ধকার রাত্রে চুপি চুপি শ্রীনাথ হাবীকে তাহাদের বাড়ীর কাছে রাখিয়া পলাইয়া গেল। হাবী তো চেঁচাইয়া কাঁদিতে জানে না, হাবীর নিঃশব্দ ক্রন্দন যিনি শুনিবার তিনিই শুনিলেন। হাবী কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে আসিয়া বড় ঘরের দাওয়ার উপর বসিল। হাবী পাপপুণ্য জানে না; তাহার মনে পশ্চাৎতাপও নাই, পাপের সঙ্কোচ-বোধও নাই। তাহার কেবল দুঃখ এই যে, শ্রীনাথ তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

মানুষের শব্দ শুনিয়া বিন্দুপিসি প্রদীপ জ্বালিয়া বাহিরে আসিলেন; হাবীকে দেখিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বসিলেন। হাবীর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সকল বুঝিয়া বৃদ্ধা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—"ওঃ আমার পোড়া কপাল! সেই হতভাগাই যে তোর সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তা আমি বুঝেছি।" এইবার হাবী মায়ের ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিল—কাজটা অন্যায় হইয়াছে, অন্ততঃ মায়ের অভিপ্রেত হয় নাই। এইবার হাবী একটু নূতন রকমে কাঁদিল। হাবীর মা বলিলেন,—"আর এদেশে থাকা ঠিক নয়, ছোঁড়া আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে। এখানে থাক্‌লে কলঙ্কের ঢাক দুদিনেই বেজে উঠ্‌বে, যশোরে গিয়ে সরকার মহাশয়ের আশ্রয়ে থাক্‌ব।"

(৬)

চৈত্র মাস। চৈত্রের রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে। মধ্যে একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হাবীর একটি ছেলে হইয়াছে, ছেলেটির বয়স ছয় মাস। হাবী ছেলেটিকে লইয়া থাকে, আর ছেলের

সেবায় দিনপাত করে। শ্রীনাথের কোন খোঁজ-খবর নাই। শ্রীনাথের পিতাও কোন খোঁজ-খবর লন না। দিব্যি ছেলেটি, গোলগাল নধর,—যেন জাতি-ফুলের স্তবক! হাবীর বিষাদমাখা মুখে ছেলে দেখিলেই হাসি ফুটিয়া উঠে। হাবীর মাও ছেলেটির যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু ছেলেটিকে দেখিলেই তিনি কেবল কাঁদেন। হাবীর দিদি-মার কোন বালাই নাই; দামালে ছেলেকে কোলে করিবার সাধ হইলেও বুড়ি সাম্‌লাইতে পারে না, আর বলে—বিন্দির নাতি ভারি দুষ্টু, যেন থাঙ্গা খাঁ। আমি কি এতই বুড়ো হইচি যে, ওকে সাম্‌লাতে পার্‌ব না?"

এই ভাবে হাবী, হাবীর মা ও হাবীর দিদি-মা যশোরের কোন এক পল্লীতে এক খোড়ো ঘরে থাকিয়া সুখে দুঃখে দিন কাটাইতেছে। সরকার মহাশয় হাবীর বাপের বাল্যবন্ধু; সরকার মহাশয় হাবীদের সংসারের খরচ যোগাইয়া থাকেন। অতি শৈশবে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া হাবীর বাক্‌-শক্তি রহিত হইয়া যায়। এত দিন কোন চিকিৎসাই হয় নাই। সরকার মহাশয় দয়া করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের বিশ্বাস যে, হাবী কথা কহিতে পারিলে হয় ত শ্রীনাথ তাহাকে আবার গ্রহণ করিবে। চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, হঠাৎ আবার একটা বড় সুখ কি দুঃখ পাইলে হাবীর কথা ফুটিলেও ফুটিতে পারে।

যশোহরের বাজারে মহা কোলাহল ধ্বনি উঠিয়াছে! আগুন—আগুন—বলিয়া একটা বিকট শব্দ শুনা যাইতেছে। সর্ব্বনাশ!! —একে জোর বাতাস, তায় চৈত্র মাস, ঠিক্ দুপুর বেলা, তার উপর চারিদিকেই খড়ের ও বেড়ার ঘর! দেখিতে দেখিতে

আগুন শতজিহ্বা প্রকাশ করিয়া চরিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হাহাকার রোলে দিঙ মণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল।

এ কি এ! হাবীদের মট্‌কার চালে যে আগুন ধরিল! এ যে বেড়া আগুন! কোন দিক্ দিয়াই বাহির হইবার যো নাই। সর্ব্বনাশ হইবার সূচনা দেখিয়া হাবীর মা হাবীকে বলিলেন,—"হাবী! তুই ছেলে নিয়ে পালা। যদি পারিস্ তো ছেলেটাকে বাঁচা, নিজেও বাঁচ্। আমি বুড়ো মাকে নিয়ে এখানে ব'সে থাকি। জগদম্বার দয়া হয়, মায়ে-ঝিয়ে পুড়ে মর্‌বো। ও বুড়ীকে নিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে পার্‌বো না। তবুও তুই বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারিস্, এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌লে মায়ে-ঝিয়ে সুখে মর্‌তে পার্‌বো।" হাবীকে আর বলিতে হইল না। বলিলেও বা হাবী শুনিত কি! সর্ব্বভুক্ বহ্নির লোলজিহ্বা-বিস্তার দেখিয়া হাবি খোকাকে বুকে লইয়া মুক্তকেশে উর্দ্ধমুখে ছুটিতে লাগিল। ধূমে ও অগ্নি-জ্বালায় দিক্-নির্ণয় করা যায় না। হাবীর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই; দহ্যমান বংশ ও কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া সে ছুটিতে লাগিল। কেশরাশির বিস্তারে অগ্নি ধরিয়া গেল, অগ্নিজিহ্বা আসিয়া দেহের বস্ত্রাবরণকে স্পর্শ করিতে লাগিল,—হাবীর তবুও দৃক্‌পাত নাই; সে খোকাকে বুকে ধরিয়া, বুকের মধ্যে লুকাইয়া ছুটিতে লাগিল। চারিদিকে ক্রন্দন-কোলাহল, আর্ত্তের কাতর শব্দ, মুমূর্ষুর বিকট যাতনাদায়ক ধ্বনি; তবু হাবীর কোন জ্ঞান নাই। চুল পুড়িয়া গিয়াছে, দেহের বস্ত্রখণ্ড পুড়িয়া দেহের স্থানে স্থানে চর্ব্বির সহিত যেন মিশিয়া আছে, ভ্রূ ও নয়ন-পল্লব পুড়িয়া গিয়াছে, নাসিকাগ্র পুড়িয়া যেন গলিয়া পড়িতেছে, পায়ের আঙুলের নখগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া

গিয়াছে; কিন্তু বুকের দিকের কাপড় পোড়ে নাই; খোকার গায়ে অল্পবিস্তর তাপ লাগিয়াছে বটে, কিন্তু দেহে দাহক্ষত হয় নাই।

হাবী ছুটিতেছে। যাহার দেখিবার অবসর আছে, সে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে, হাবীকে যাইবার পথ দিতেছে। হাবী ছুটিয়া আসিয়া বড় রাস্তায় পড়িল। সেখানে লোকে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া যাইবার যো নাই। কিন্তু সম্মুখে একি এ! এই কে একজন জলের কলসী কাহার কাঁধে উঠাইয়া দিল না? কর্দ্দমাক্তকলেবর হইলেও, এ যে—সেই! এ যে সেই শ্রীনাথ! ছুটিয়া গিয়া হাবী শ্রীনাথের কাছে দাঁড়াইল। তাহাকে চিনিতে পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বুকের ধন খোকাকে বাহির করিয়া তাহার হাতের উপর দিয়া চীৎকার করিয়া হাবী বলিয়া উঠিল—"তোমার ছেলে তুমি নাও, আমি আর পারি না!"

ভূতলে দগ্ধ বংশখণ্ডের ন্যায় হাবীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। শ্রীনাথের কোলের ছেলে, শ্রীনাথের দিকে তাকাইযা ঠোঁট ফুলাইয়া আধ ভাষায় 'মা' বলিযা কাঁদিয়া উঠিল।